১৭ অক্টোবর ১৯৯০ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

□ মিলিত জার্মানিকে রোখা কঠিন
□ ব্রুস লি-র গুরু কানাজাওয়া
□ জমবে 'অ্যাশেজ' সিরিজ
□ চমক দূরপাল্লার সাঁতারে

আনন্দমেলা

মার্ক টেলরের পোস্টার

গুপ্তচরদের গোপন কথা

□ গুপ্তচরবৃত্তির রোমাঞ্চকর কাহিনী। □ কীভাবে খবর সংগ্রহ করে গুপ্তচররা ?
□ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কীভাবেই বা খবর পাচার করে ?

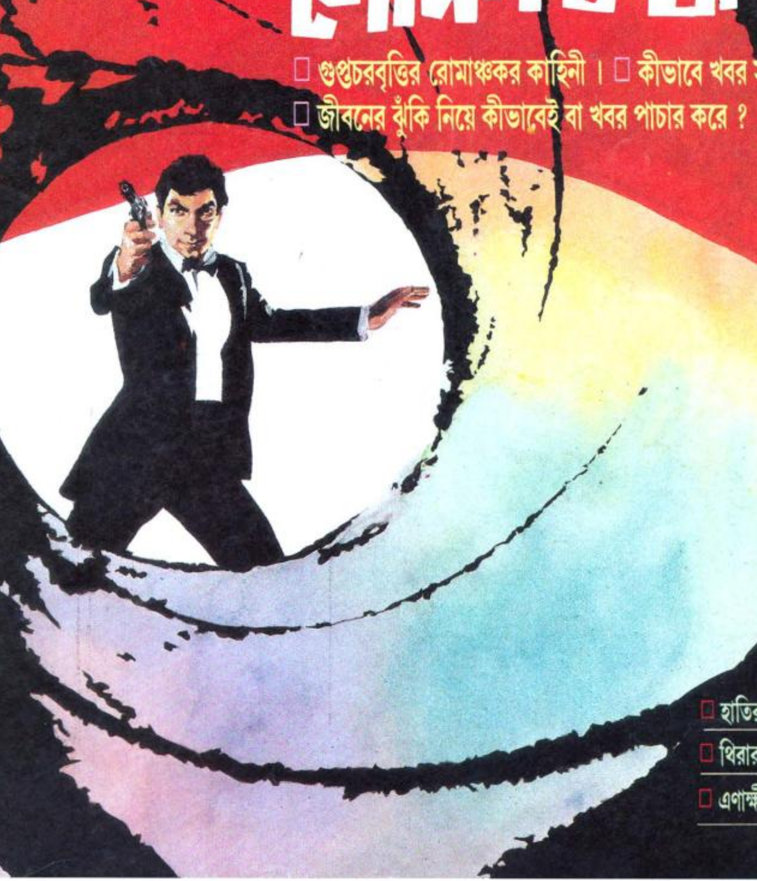

□ হাতির দাঁতের পাহাড়ের খোঁজে
□ থিরার রহস্যের সন্ধানে
□ এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের ভূতের গল্প

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - নীলাচল দা

স্ক্যান করেছেন - নীলাচল দা

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

একটু পরিকল্পনার ফল অনেক ভালবাসার ফসল... এমনকি অল্প সঞ্চয়ের দৌলতে আপনার সন্তান লাখপতি ২১ বছরে।

বিনিয়োগ করুন ইউনিট ট্রাস্ট-এর শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি-তে।

আজ ও আপনা'র আদরের ছোট্ট সোনামণি, আপনার কোলে খুশিতে খিলখিলিয়ে খেলছে, আরাম ও নিরাপত্তা বোধ করছে। কিন্তু, অদূর ভবিষ্যতে, আগামীযুগ যখন ওর সামনে উপস্থিত হবে, ও যখন নতুন জগতে প্রবেশ করবে, কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হবে, তখন কি হবে, ভেবে রেখেছেন কি ?

আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্যে এখনই একটা পরিকল্পনা ছকে ফেলুন না। বিনিয়োগ করুন ইউনিট ট্রাস্ট-এর শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি-তে। এই যোজনার অধীনে, এক নির্ধারিত মেয়াদকালের মধ্যে অল্প স্বল্প বিনিয়োগের দৌলতে আপনার সন্তান ২১ বছর বয়সে একেবারে লাখপতি হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আপনার সন্তানকে লাখপতি বানাতে আপনি বিনিয়োগ করবেন কিভাবে ?

উত্তর : সন্তান জন্মাবার পরেই যদি আপনি শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধিতে করতে চান বিনিয়োগ, তো দেখুন খুশিমত কত নানান সুযোগ : (১) শিশুর জন্মের সময় থেকে তার ১৫ বছর বয়স অবধি আপনি প্রতি বছরে ১১০০ টাকা করেও বিনিয়োগ করতে পারেন। (২) আপনি উপর্যুপরি ৩ বছরে ৩,২০০ টাকা করে এতে জমা দিন বা উপর্যুপরি ৬ বছর ধরে ১,৯০০ টাকা করে বিনিয়োগ করুন। (৩) আপনি একথোকে ৮,৫০০ টাকাও বিনিয়োগ করতে পারেন।

প্রশ্ন : যদি বাচ্চা বড় হয়ে গিয়ে থাকে তো ?

উত্তর : দেখুন, ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি বয়সের জন্য আলাদা আলাদা পরিকল্পনা রয়েছে। শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি (CGGF) সংক্রান্ত পুস্তিকায় দেয়া চার্টে এর বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া আছে। অনুগ্রহ করে এটির জন্যে লিখুন।

প্রশ্ন : শিশুকে কারা কারা উপহার দিতে পারেন ?

উত্তর : পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সংস্থাসমূহ বা করপোরেট বডিসমূহ।

প্রশ্ন : আপনি কমপক্ষে কত টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন ?

উত্তর : কমপক্ষে ৫০০ টাকা এবং তারপরে ১০০ টাকার গুণিতকে।

প্রশ্ন : এই বিনিয়োগ করে কত করে রিটার্ন পাবো ?

উত্তর : বার্ষিক ১২.৫% করে এবং সেইসঙ্গে প্রতি ৫ বছরে এক বোনাস ডিভিডেণ্ড।

প্রশ্ন : মেয়াদকাল পূর্তির পর আরো কোনো সুযোগ-সুবিধে আছে কি ?

উত্তর : এই টাকা তুলে নেয়ার বদলে আপনার সন্তান ইউ টি আই-এর সেইসময়ে প্রাপ্তিযোগ্য যেকোনো যোজনায় বিনিয়োগও করতে পারে।

শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি (CGGF) সংক্রান্ত বিনামূল্যের পুস্তিকার জন্যে যেকোনো ইউনিট ট্রাস্ট অফিস বা প্রধান প্রতিনিধি বা এজেন্ট, অথবা নির্ধারিত হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম বা ইণ্ডিয়ান অয়েলের পেট্রোল পাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কিংবা আমাদের যেকোনো অফিসে লিখুন।

আরো বিশদ জানতে এই কুপনটি ভরে ডাকযোগে নিচে দেয়া ইউনিট ট্রাস্ট-এর যেকোনো অফিসে পাঠিয়ে দিন।

আমাকে শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি (CGGF) সংক্রান্ত বিনামূল্যের পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন।

নাম : ____________________

ঠিকানা : ____________________

____

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

(একটি সরকারি ক্ষেত্রের আর্থিক সংস্থা)

- ১৩, স্যার বিঠ্ঠলদাস থ্যাকার্সী মার্গ, (নিউ মেরিন লাইন্স), বম্বে ৪০০ ০২০; ফোন : ২৮৬৩৭৬৭, ৬২০১৯৯৫
- ২ ও ৪, ফেয়ারলী প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১; ফোন : ২০৯৩৯১/২০৫৩২২
- গুলাব ভবন (পেছনের ব্লক), ২য় তলা, ৬, বাহাদুর শাহ্ জাফর মার্গ, নিউ দিল্লী ১১০ ০০২; ফোন : ৩৩১৮৬৩৮/৩৩১৯৭৮৬
- জাষ্টিস বশীর আহ্‌মেদ সৈয়দ বিল্ডীং, ৪৫, সেকেণ্ড লাইন বীচ, মাদ্রাজ ৬০০ ০০১; ফোন : ৫৮৭৪৩৩/৫৮০৯৩৮

Sista's-UTI-29/90 BEN D

৩০ আশ্বিন ১৩৯৭ □ ১৭ অক্টোবর ১৯৯০ □ ১৬ বর্ষ ১৩ সংখ্যা

আনন্দমেলা

■ সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ) ■
চাঁদের মাঠে ওয়ান ডে সিদ্ধার্থ ঘোষ ৬০
■ গল্প ■
একেই কি বলে কুয়াশা এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ২৬
বাড়ি ফেরার পর শুক্তি চৌধুরী ৭৬
■ ধারাবাহিক উপন্যাস ■
কালাপাহাড় সমরেশ মজুমদার ৩৭
সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৫৫
■ প্রচ্ছদকাহিনী ■
গুপ্তচরদের গোপন কথা সব্যসাচী সরকার ১২
কিম ফিলবির রোমাঞ্চকর জীবন চঞ্চল পাল ২২
■ অ্যাডভেঞ্চার ■
হাতির দাঁতের পাহাড়ের খোঁজে সঙ্কর্ষণ রায় ৬
■ বিজ্ঞান : গবেষণা ■
থিরার রহস্যের সন্ধানে অরূপরতন ভট্টাচার্য ৩২
■ কমিক্‌স ■
রোভার্সের রয় ৫১, গাবলু ৫৩, টারজান ৫৪, টিনটিন ৭১, ব্যাটম্যান ৭৩
■ কবিতা ■
বাজিমাত রঞ্জন ভাদুড়ী ৮
■ টাকাকড়ি ■
মৌর্যোত্তর যুগ : দক্ষিণ ভারতের···ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৮
■ কেরিয়ার গাইড ■
টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস অমর দাশ ২৪
■ খেলাধুলো ■
চমক দূরপাল্লার সাঁতারে তমাল মুখোপাধ্যায় ৪২
জমবে 'অ্যাশেজ' সিরিজ অনির্বাণ দত্ত ৪৪
দুই জার্মানি মিলনের পর···তানাজি সেনগুপ্ত ৪৬
কেন পিছিয়ে অন্যান্য দেশ শিবাজি ঘোষ ৪৮
কানাজাওয়া বলে গেলেন···হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় ৪৯
রঙিন পোস্টার : মার্ক টেলর ৪১
■ নিয়মিত বিভাগ ■
চিঠিচাপাটি ৫, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ৩০, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৫০, শব্দসন্ধান ৬২, আকাশে ওড়ার কথা ৬৯, ক্যাম্পাস ৭০, নানারকম ৭৫, হাসিখুশি ৭৮, আঁকিবুকি ৭৮, কুইজ ৮০
■ প্রচ্ছদ ■
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ অসিত পাল, প্রবীর সেন

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার।
দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

১২

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গুপ্তচরদের কাজ করতে হয়। এক একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ খবর গোপনে সংগ্রহ করে সেগুলি নিজের দেশে পাচার করাই তাদের কাজ। ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই। তবু প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই তারা কাজ করে। গুপ্তচরবৃত্তি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে গুপ্তচরদের রোমাঞ্চকর কাণ্ডকারখানার কথা লেখা হয়েছে। মাতাহারি, কিম ফিলবি ও আরও কয়েকজনের কথা আলোচনা করা হয়েছে দুটি নিবন্ধে। গুপ্তচরদের নিয়ে চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে আছে জেম্‌স বন্ডের কথা।

৪৪

বিশ্বের সেরা তিন ন্যাটা ব্যাটসম্যানকে খেলতে দেখা যাবে আসন্ন 'অ্যাশেজ' সিরিজে। কম্পিউটার র‍্যাঙ্কিং-এ বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটসম্যান এখন অস্ট্রেলিয়া দলের মার্ক টেলর। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালান বর্ডারও কম যান না। এই দুই ন্যাটা ব্যাটসম্যানের বিপক্ষে থাকবেন ইংল্যান্ডের ডেভিড গাওয়ার। স্টাইলের দিক থেকে কিন্তু গাওয়ারই সেরা। কে কাকে টেক্কা দেন, এটাই এবার দেখার বিষয়। অস্ট্রেলিয়ার বোলিং ইংল্যান্ডের চেয়ে শক্তিশালী।

৩২

ঈজিয়ান সাগরের বুকে ছোট্ট একটি দ্বীপ। নাম থিরা। থিরার মাত্র সত্তর মাইল দক্ষিণে আছে আর একটি দ্বীপ। তার নাম ক্রিট। হারানো আটলান্টিসের খোঁজে থিরার সঙ্গে ক্রিটের নামও একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। পুরাতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক নানা রহস্যের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে থিরায়। এ-বিষয়ে প্রকাশিত হল একটি নিবন্ধ।

■ আগামী সংখ্যায় ■

মাদাম তুসো-র মোমের মানুষদের নিয়ে গৌতম চক্রবর্তীর প্রচ্ছদকাহিনী

সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান-উপন্যাস (শেষাংশ) চাঁদের মাঠে ওয়ান ডে

রতন ভট্টাচার্যের গল্প বিলুপ্ত প্রজাতি

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান

কারণ কমপ্লান ওদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়।

সাধারণত ১৫/১৬ বছর পর্যন্তই ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠার বয়েস।

প্রোটিন হোল এমন এক পুষ্টিকর উপাদান, যা বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের দৈহিক গঠনে সরাসরি কাজ দেয়। তাই এখন থেকে আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যেও চাই কমপ্লান।

কমপ্লান-এ আছে সেরা প্রোটিন অর্থাৎ দুধের প্রোটিন (২০%)। এছাড়া আছে আরো ২২ রকমের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ।

কমপ্লান বিভিন্ন মুখরোচক স্বাদগন্ধে পাওয়া যায়।

23

সুপরিকল্পিত মাত্রায়,
২৩টি একান্ত
প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।

কমপ্লান®

GX/62/234 BEN

সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

চিঠিচাপাটি

রোমাঞ্চকর প্রচ্ছদকাহিনী বিমানযুদ্ধ

আমি আনন্দমেলার বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাগুলির আগ্রহী পাঠক। ৮ অগস্ট, ১৯৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রোমাঞ্চকর বিমান-যুদ্ধ' লেখাটি পড়ে ভাল লাগল। কিন্তু, কিছু-কিছু ক্ষেত্রে একটু সংশয় রয়েছে, তাই এই চিঠি।
প্রথমত, অরভিল রাইট এবং উইলবার রাইট যে বিমানটি আকাশে উড়িয়েছিলেন (ফ্লায়ার-১) সেটি ১২০ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করেছিল, আকাশে ছিল মাত্র ১২ সেকেন্ড। কিন্তু উক্ত লেখাটিতে প্রকাশিত হয়েছে, "ফ্লায়ার ওয়ান সেদিন আকাশে ৮৫২ ফুট উড়ে গিয়েছিল, ৫৯ সেকেন্ড আকাশে কাটিয়ে সেই অদ্ভুত যান আবার পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসেছিল।"
দ্বিতীয়ত, লেখক এক স্থানে লিখেছেন আমেরিকার গ্রুম্মান যুদ্ধবিমান শত্রুপক্ষের ভয়ের কারণ। অথচ, ছবির নীচে এক জায়গায় লেখা হয়েছে, "ব্রিটেনের এক কারখানায় তৈরি হচ্ছে গ্রুম্মান এক্স যুদ্ধবিমান।" কোন কম্পানির কারিগরি কৌশলে এটি তৈরি হচ্ছে ?
তৃতীয়ত, মিরাজ বনাম এফ-সিক্সটিনের যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, সেখানে সব ঠিক থাকলেও কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। মিরাজের চাকার ব্যাস কি মাত্র ৪ থেকে ৫ মিটার ? আর, ডানার বিস্তার (Wing Span) বর্গ এককে লেখা হয়।
চতুর্থত, 'এনোলা গে' বিমানের যে চালক হিরোশিমাতে বোমা ফেলেছিলেন, তাঁর নাম পল-ডব্লিউ- টিবেট্‌স, রবার্ট লুইস নয়।
শঙ্কর মুখার্জি, রহড়া, ২৪ পরগনা

বিমান-যুদ্ধ সংখ্যাটি সত্যিই অপূর্ব এবং আমার মতো বিমান ভালবাসে এমন সব ছেলের কাছে এটি সংগ্রহে রাখার মতো বলে আমি মনে করি। এর থেকে আমরা অনেক চমকপ্রদ তথ্য পেলাম। আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। তবে, বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিমানের নাম নেই। যেমন, পৃথিবীর সবচেয়ে দামি যুদ্ধবিমান আমেরিকার এফ-ফর্টিন টমক্যাট ও ব্রিটেনের বুকানের স্ট্রাইক বম্বার। আমেরিকায় রয়েছে শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী বোমারু বিমান বি-১।
তথাগত মুখার্জি, সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল / কলকাতা-১৯

রোমাঞ্চকর বিমান-যুদ্ধ ভাল লাগল। কিন্তু এই প্রবন্ধের এক জায়গায় উড্রো উইলসনকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উনি ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। আর-এক জায়গায় পার্ল হারবারকে ব্রিটেনের যুদ্ধঘাটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ওই বন্দর ছিল আমেরিকার অধীনে।
রাজা ও দোলা, গড়বেতা, মেদিনীপুর।
শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, গড়িয়া হাই রোড (সাউথ), কলকাতা-৩১।

আমি আনন্দমেলার একজন নিয়মিত পাঠক। ৮ অগস্ট সংখ্যায় রোমাঞ্চকর বিমান-যুদ্ধ পড়ে ভাল লেগেছে। যুদ্ধবিমান আবিষ্কার, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে এবার আর কোনও প্রশ্ন নেই। আধুনিক বিমানগুলির নাম, অস্ত্রবহন ক্ষমতাও জানতে পারলাম। লেখার সঙ্গে ছবিগুলিও ছিল দারুণ ভাল।
সামিম আলি মল্লিক, হাওড়া

বিমান-যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারার জন্য ধন্যবাদ। তবে, মিগ-২৩ বিমানের আর-একটু বিশদ বিশ্লেষণ পেলে ভাল হত। 'মিগ-২৩ বি এন' ও 'মিগ-২৩ এম এফ' দুটি পৃথক শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ জঙ্গি বিমান। ভারতের বিমানবহরে রয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অ্যাটাক হেলিকপ্টার। 'মি-২৪', 'মি-২৫' ও 'মি-৩৫ এস' এর উদাহরণ।
পার্থসারথি দাস, নৈহাটি, ২৪ পরগনা।

রোমাঞ্চকর বিমান-যুদ্ধ প্রচ্ছদকাহিনীটি এক কথায় অপূর্ব। এর সাহায্যে বিভিন্ন দেশের সামরিক বিমান সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটি ধারণা গড়ে ওঠে। লেখা ও ছবি সব দিক দিয়েই সংখ্যাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
প্রসেনজিৎ দত্ত, কাপাসডাঙা, হুগলি।

লেখকের উত্তর : শঙ্করবাবুর চিঠির উত্তরে জানাই, ১৯০৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার ফ্লায়ার-১ আকাশে উড়েছিল। আপনি ঠিকই বলেছেন। প্রথমবার সেটি আকাশে ছিল মাত্র বারো সেকেন্ড। কিন্তু উইলবার বা অরভিল কেউই তাতে সন্তুষ্ট হন না, তাঁরা সেইদিনই আবার বিমানটি নিয়ে আকাশে ওঠেন। দেড় ঘণ্টার মধ্যে আরও তিনবার আকাশে উঠেছিল ফ্লায়ার-১। আমি এখানে জেনস-এর প্রামাণ্য গ্রন্থ 'ওয়ার্ল্ড এনসাইক্লোপিডিয়া অব মিলিটারি এয়ারক্রাফট' থেকে লাইনটি তুলে দিচ্ছি,...'In the ensuing hour and a half the two brothers took turns in three further attempts, during the last of which Flyer I managed to travel 852 feet in the air piloted by Wibber, remaining aloft for 54 seconds.
দ্বিতীয়ত, ব্রিটেন আজকাল গ্রুম্মান এক্স যুদ্ধবিমান তৈরি করছে। কোন কম্পানি এ বিষয়ে আমেরিকার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, তা আমাদের পক্ষে বলা মুশকিল।
তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমি জেন্‌স-এর এয়ারক্রাফ্‌ট ডিরেক্টরির সাম্প্রতিকতম,১৯৮৯-'৯০-এর সংস্করণটি থেকে কয়েকটা লাইন তুলে দিচ্ছি। এটি ওই গ্রন্থের ৭২ নং পৃষ্ঠায় মিরাজ সম্বন্ধে দেওয়া তথ্য।
Wing span....9.13 m. (29f ft. 13½ inch)
Wings, gross...41.0 m^2 (441.3 sq. ft.)
শঙ্করবাবু এখন নিশ্চয় ডানার বিস্তার ও ডানার সামগ্রিক ক্ষেত্রফলের পার্থক্য বুঝতে পেরেছেন। কোনটি বর্গ এককে, আর কোনটি সাধারণ এককে মাপা হয় তা নিয়েও নিশ্চয় আর সংশয় নেই।
ওই পৃষ্ঠায় আরও দেওয়া আছে
Wheel track...3.40 m.
Wheel base...5.00 m.
'এনোলা লে' বিমানের চালকের নাম রবার্ট লুইস। এই তথ্য দেওয়া আছে বইতে। আর হ্যাঁ, উড্রো উইলসন ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। পার্ল হারবারকে মূল লেখায় মার্কিন যুদ্ধঘাটি বলে উল্লেখ করা থাকলেও আর-এক জায়গায় ওটিকে ব্রিটিশ যুদ্ধঘাটি লেখা হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

অ্যাডভেঞ্চার

হাতির দাঁতের পাহাড়ের খোঁজে

মৃত্যুর সময় হলে হাতিরা বনের মধ্যে বিশেষ একটি জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়, সেখানেই মারা যায় । এভাবেই হাতির দাঁত জমতে-জমতে পাহাড়প্রমাণ হয়ে ওঠে । সত্যিই কি আছে হাতির দাঁতের পাহাড় ? আলোচনা করেছেন সঙ্কর্ষণ রায়

সেপ্টেম্বর মাস, ১৯৭২ সাল । আমি তখন ভুটানের রায়ডাকে ক্যাম্প করে আছি । সমতলভূমির বুক ফুঁড়ে হিমালয় পর্বত যেখানে সহসা প্রকাশ পেয়েছে, রায়ডাক সেখানে একটি ছোটখাটো শহর । আমার ক্যাম্প শহরের বাইরে পাহাড়ের নীচে ঝরনাতলার নির্জনে । কাছাকাছি আর-একটি ক্যাম্প আছে, সেখানে ড্রিলার শিবচৈতন্য সামন্ত তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে আছে । শিবচৈতন্যের কাজ ড্রিলিং মেশিন চালানো । ড্রিলিং মেশিন দিয়ে মাটি ও পাথরের স্তর ফুঁড়ে একটি দুর্লভ খনিজ খোঁজা হচ্ছে । ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমি ড্রিলিংয়ের জায়গা দেখিয়ে দিই শিবচৈতন্যকে । সেখানে সে ড্রিলিং মেশিন বসিয়ে ড্রিলিং করে । পর পর তিনটি জায়গায় ড্রিলিং শেষ করে চতুর্থ জায়গায় ড্রিলিংয়ের আয়োজন চলছে, এমন সময় ফুন্টশোলিং থেকে এলেন সেখানকার থ্রিমপন (ম্যাজিস্ট্রেট) দাশো গেনসেল ও হাতির দাঁতের কারবারি নারায়ণ প্যাটেল ।

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পর দাশো বললেন, "এখনকার মতো আপনাদের কাজ বন্ধ রেখে চলুন আমাদের সঙ্গে, হাতির দাঁতের ভাণ্ডার খুঁজে বের করতে হবে ।"

"হাতির দাঁতের ভাণ্ডার !" আমি অবাক হয়ে তাকালাম দাশোর মুখের দিকে । "খনিজের ভাণ্ডারের মতো হাতির দাঁতের ভাণ্ডার হয় নাকি ?"

"অবশ্যই হয় । হাতি যেখানে মারা পড়ে, সেখানে তার দাঁত জমতে থাকে । মৃত্যুর সময় হলে হাতিরা বনের মধ্যে বিশেষ একটি জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয় এবং সেখানেই মারা যায় ।

মরে গিয়ে রেখে যায় দাঁত । এই দাঁত জমতে-জমতে পাহাড়প্রমাণ হয়ে ওঠে ।"

"বলেন কী !"

"আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তো ? চলুন আমার সঙ্গে, নিজের চোখেই দেখবেন ।"

"কোথায় যেতে হবে ? মানে কোথায় আছে এই হাতির দাঁতের পাহাড় ?"

"খুঁজে বের করতে হবে । তিনটি পাহাড় যেখানে মিশে গিয়েছে, সেখানেই কোথাও আছে এই হাতির দাঁতের পর্বত । জায়গাটির হদিস ডি এফ ও প্রণব রায়চৌধুরী জানেন,

তিনি এলেই বেরিয়ে পড়ব আমরা।"
"কিন্তু আমরা আমাদের কাজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি কী করে ?"
"এখন থেকে এটাই আপনাদের কাজ। প্রণব আসামাত্র আমাদের সঙ্গে যাত্রা করবেন আপনারা— এই মর্মে আপনাদের ডিরেক্টর পৃথ্বীশ কর একটা চিঠি দিয়েছেন।" বলে বকুর (হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো ভুটানি কোট) পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে আমার হাতে গুঁজে দিলেন দাশো।
প্রণব রায়চৌধুরী আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কাজেই দাশো নারায়ণ প্যাটেলকে নিয়ে রায়ডাকের ডাকবাংলোতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু তাঁরা দু'জন ছাড়া ওখানে আর কেউই ছিলেন না বলে রাতভোর হওয়ার আগেই আমার ক্যাম্পে এসে হাজির হলেন তাঁরা। আমার ঘুম ভাঙিয়ে আমার হাত ধরে দাশো মিনতিমাখানো স্বরে বললেন, "দোহাই আপনাকে পাথরসাহেব, আপনারা সকলেই চলে আসুন ওই ডাকবাংলোতে, ফাঁকা বাড়িতে আমরা তিষ্ঠোতে পারছি না— বাংলোটার সবক'টা ফাঁকা ঘর, ভূত-পেত্নিতে বোঝাই হয়ে আছে। ওরকম নির্বোধের মতো চেয়ে আছেন কেন, আপনারা কি জানেন না, যে-কোনও শূন্যস্থানকে পূর্ণ করে থাকে ভূত-পেত্নিরা!"
নারায়ণ আমতা-আমতা করে বললেন, "কই, আমি তো কিছু টের পাইনি..."
"তুমি টের পাবে কী!" রাগত স্বরে বলে ওঠেন দাশো, "ভূত-পেত্নির ব্যাপারে তুমি কি জানো বা বোঝো! তোমরা সমতলভূমির মানুষরা ভূত-পেত্নি সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ! পাহাড়ের এলাকার একজন শিশুও জানে যে, শূন্যস্থান মাত্রই ভূত-পেত্নি দিয়ে পূর্ণ হয়ে থাকে, অতএব কোনও জায়গা ফাঁকা রাখতে নেই। চলুন রায়সাহেব, আপনারা সকলে আসুন ওই ডাকবাংলোতে, আমাদের অতিথি হয়ে থাকবেন..."

> **চ**ড়াই যখন শেষ হল, তখন ভোর হয়ে এসেছে। টঙ্কাবাহাদুর বললে, "আমরা দোরোনা পাহাড়ের মাথার ওপর এসেছি। এই সেই জায়গা।"
> "হাতির দাঁতের পাহাড় কই ?" দাশো উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করেন।
> "খুঁজে বের করতে হবে। বাবার কাছে শুনেছি, এখানেই কোথাও আছে হাতির গোরস্থান, সেখানে হাতির দাঁত জমে-জমে পাহাড়ের আকার নিয়েছে।"

দাশোর কথাবার্তার ভঙ্গিতে বুঝলাম আমরা যদি তাঁর অনুরোধ না রাখি, স্থানীয় ভুটানি পুলিশের সাহায্যে আমাদের জোর করে ডাকবাংলোতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন তিনি। অতএব আমাদের ক্যাম্প নেপালি দরোয়ানের জিম্মায় রেখে আমরা দাশোর সঙ্গে ডাকবাংলোতে গেলাম।
তখন সকাল প্রায় সাতটা। উজ্জ্বল সকাল, মেঘমুক্ত আকাশ নীলার মতো নীল। সবুজ পাহাড় রোদে ঝলমল করছে, ডাকবাংলোটা যেন এই সবুজ পটে আঁকা হলুদ ও লাল রঙের ছবি। পশ্চিম দিকে পাহাড়ের খাঁজের মধ্য দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া চোখে পড়ছে, উজ্জ্বল সাদা একটা ছুরির ফলা যেন। পুব থেকে পশ্চিম দিকে প্রসারিত হিমালয়ের ফুট-হিল্‌সের তিনটি সমান্তরাল গিরিশ্রেণী চোখে পড়ছে। পেছনের পাহাড় ধূসর, সামনে যেন সবুজ রঙের ঢল নেমেছে। ডাকবাংলোর পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে ধানচাষ করা হয়েছে। কাছেই এই পাহাড়েরই কোলে নেপালিদের বস্তি, সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে অনবরত।
ডাকবাংলোর সামনের বারান্দায় বসে চা খেতে-খেতে দাশোর পাঁচালি শুনছি, এমন

সময় আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এল, আকাশের শূন্যস্থান মেঘের পাহাড় দিয়ে পূর্ণ হয়ে উঠল। আকাশের মেঘ নেমে এসে পাহাড়ের গায়ে জমে, মেঘের আবরণ পাহাড়টাকে মেঘের পাহাড়ে পরিণত করেছে। তারপর হঠাৎ বৃষ্টি নামল। প্রবল বৃষ্টি। মনে হচ্ছে, আকাশ থেকে যেন জলের ঢল নেমেছে। খানিকক্ষণ বাদে বৃষ্টি থামলেও পাহাড়ের গা বেয়ে জলস্রোত নেমে আসতে থাকল। মেঘও নেমে এসে কুয়াশার মতো চারদিক আচ্ছন্ন করে ফেলল।

দাশো বললেন, "দেখছেন তো, আপনারা এসে বাকি ঘরগুলো দখল করতেই ভূত-পেত্নিরা বিদায় নিয়েছে!"

"এখন থেকে বিদায় নিয়ে হয়তো তারা আমাদের ক্যাম্পে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে।"

শিবচৈতন্য বললে, "আমরা তো আমাদের ক্যাম্প ফাঁকা করে দিয়ে এখানে চলে এসেছি।"

"না।" দাশো গম্ভীরমুখে মাথা নাড়লেন, "পাহাড়ের ভূত পাহাড় ছেড়ে নীচে নামে না। ডাকবাংলোর আশেপাশে কাছেই কোনও গুহা বা গহ্বরের মধ্যে আছে তারা..."

> **এই দোরোনা পাহাড়ের মাথায় কোনও পাহাড় বা ঢিবি তো চোখে পড়ছে না। প্রণব বললেন, "যা নেই তা চোখে পড়বে কী করে! হাতির দাঁতের পাহাড় গল্পকথা ছাড়া আর কিছু নয়। হাতির দাঁত তার মৃতদেহের সঙ্গে পচে-গলে মাটিতে মিশে যায়।"**

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা গর্জন শোনা গেল। শুনে মনে হল যেন অনেক বাঘ সমস্বরে চিৎকার করছে।

"শুনতে পাচ্ছেন তো!" শিবচৈতন্যের দিকে তাকিয়ে দাশো বললেন, "নিকটেই আছে ওরা, এই ডাকবাংলো ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে বলে রেগে গিয়ে তর্জন-গর্জন করছে..."

সারারাত ধরে চলল এই তর্জন-গর্জন। থামল ভোরবেলায়, পুব আকাশে শুকতারা ফুটে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে। আকাশে তখন মেঘের চিহ্নমাত্রও নেই, সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে পাহাড়ের গা বেয়ে আলোর স্রোত বইতে শুরু করেছে।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে জিপে করে এলেন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার প্রণব রায়চৌধুরী। নিজেই জিপটাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন একজন বুড়ো নেপালিকে। দাশোর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "এই টঙ্কাবাহাদুর আমাদের নিয়ে যাবে ওখানে।"

"টঙ্কাবাহাদুর আমাদের নিয়ে গেলে কী হবে!" দাশো গম্ভীরমুখে বললেন, "ওঁরা আমাদের যেতে দিলে তো!"

"ওঁরা কারা?"

"যাঁদের এলাকায় এসে গিয়েছি। সারারাত ধরে তাঁরা তর্জন-গর্জন করেছেন..."

"তাঁরা কারা? রায়সাহেব, আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিন..."

আমি বুঝিয়ে দিতেই মৃদুমন্দ হাসতে-হাসতে

কবিতা

কাজিমাত

রঞ্জন ভাদুড়ী

সেই বিজয়ায় বিসর্জনের পরে
বেশ ক'টা দিন কাটল খালি-খালি—
মধ্যিখানে লক্ষ্মী গেলেন ঘুরে,
পক্ষশেষে এলেন এবার কালী।

সঙ্গে-সঙ্গে বাজির বাজার হাজির—
তুবড়ি হাউই সাইরেন ফুলঝুরি,
পটকা বোমা শব্দ করে ফাটে,
রংমশালের আলোর জারিজুরি।

ছুঁচোবাজি বড্ড পাজি, এখন
ওই বাজিটা বানায় না আর কেউ,
ব্যাঙবাজিতে আগুন দিয়ে জলে
ছুঁড়লে পরে তুলবে আলোর ঢেউ।

হাতচরকি তাতার হাতে ঘোরে,
ঠাম্মা বলেন, 'এলেন চক্রধারী!'
ভুঁইচরকির ঘুরন দেখে মিমি
হাততালি দেয়—এই বাজিটা তারই।

রোশনিঝরা দীপান্বিতার রাতে
এমনিতরো হাজার বাজির মেলা,
অমাবস্যার ঘনান্ধকার চিরে
আলোর সাথে শব্দ করে খেলা।

ছবি : দেবাশিস দেব

প্রণব বললেন, "ও তো ধস নামার শব্দ, বৃষ্টির পর এখানে পাহাড় থেকে ধসের পর ধস নেমেই থাকে।"
"ধস !" প্রণবের মুখের ওপরে তীব্র দৃষ্টি হেনে দাশো বললেন, "ভূত-পেত্নির তর্জন-গর্জনকে বলছে ধস নামার আওয়াজ। নাস্তিক আর কাকে বলে !"
ভূত-পেত্নির তর্জন-গর্জন সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা প্রকাশ করে না টঙ্কাবাহাদুর। সে বললে, "এখনই চলুন, আর-এক সেকেন্ডও দেরি না করে। আমি তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছে আমার হাতিটাকে উদ্ধার করতে চাই।"

টঙ্কাবাহাদুরের একটি পোষা হাতি ছিল। বুনো হাতির একটা দলের সঙ্গে সে নাকি রায়ডাকের উত্তরে জলশিথুঙ্কার দিকে চলে গিয়েছে। রায়ডাক থেকে শুরু করে রাজরুখ ও পাবজিখাঁও হয়ে জলশিথুঙ্কার দিকে চলে গিয়েছে হাতি চলাচলের পথ। এ জঙ্গলের বুনো হাতিরা এ-পথেই চলাচল করে। কাজেই এই পথেই তার পোষা হস্তিনী দেওকালি তার বন্য সঙ্গীদের সঙ্গে গিয়েছে বলে টঙ্কাবাহাদুরের ধারণা।
দাশো বললেন, "আমরা তো তোমার দেওকালিকে খুঁজতে যাচ্ছি না, হাতির দাঁতের পাহাড়ের খোঁজে যাচ্ছি। আমাদের ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তো তোমাকে কাজে বহাল করেছেন প্রণববাবু। কাজেই তোমার কর্তব্য..."
"আমার কর্তব্য আমার দেওকালিকে খুঁজে বের করা।" দাশোর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে টঙ্কাবাহাদুর বললে, "আমি ওদিকে যাচ্ছি শুনেই প্রণববাবু সদলবলে আমার সঙ্গ নেবেন বলেছেন। আমি আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেও আপনাদের মাইনে-করা গাইড নই। কাজেই আমি চলব আমার মর্জিমতো, আপনাদের ইচ্ছে হলে আমার সঙ্গে আসতে পারেন আপনারা।"
"ইচ্ছে হোক বা না হোক, তোমার সঙ্গে আমরা যেতে বাধ্য।" প্রণব বললেন, "কারণ ও-পথে আমরা কখনওই যাতায়াত করিনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ওখানে হাতির দাঁতের পাহাড় আছে কি না ?"
"আছে বইকী।" টঙ্কাবাহাদুর জবাব দিল, "আমি নিজের চোখে না দেখলেও আমার বাবা ও ঠাকুর্দা দেখেছেন।"
"নিজের চোখে যা দ্যাখোনি, তার কাছে আমাদের নিয়ে যাবে কী করে ?"
"তার কাছাকাছি নিয়ে যাব। তারপর খুঁজে বের করতে হবে।"

হাতির খুলির বিবর্তন

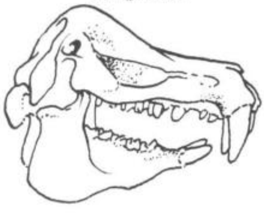

সাড়ে তিন কোটি বছর আগে

দেড় কোটি বছর আগে

৩০ লক্ষ বছর আগে

বর্তমানে

দাশো বললেন, "আমি তো শুনেছি, তিন পাহাড় মিলেমিশে যেখানে এক পাহাড় হয়েছে, সেখানেই আছে হাতির দাঁতের পাহাড়..."
টঙ্কাবাহাদুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে থাকি আমরা। টঙ্কাবাহাদুর বললে যে, হাতিদের পায়ে-পায়ে এ-পথের সৃষ্টি। এ-পথ ধরেই দীর্ঘকাল ধরে হাতিরা চলাচল করছে। পাহাড় বেষ্টন করে পথটা ধীরে-ধীরে চড়াই বেয়ে এগিয়ে গেছে। ঘাসের আড়ালে প্রচ্ছন্ন এ-পথ চোখে পড়ে না, পায়ে-পায়ে অনুভব করে নিতে হয়। এ-ক্ষমতা টঙ্কাবাহাদুরের থাকলেও আমাদের আর কারও নেই, কাজেই অনেক কষ্টে আমরা তাকে অনুসরণ করি !
পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট গ্রাম রাজরুখ। কাঠুরেদের গ্রাম। কয়েকটি কাশ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি ঝুপড়ি। গ্রামে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না, প্রতিটি ঝপড়িই শূন্য। টঙ্কাবাহাদুর বললে, "মনে হচ্ছে একটা হাতির পাল চলে গিয়েছে এখান দিয়ে, কাজেই ঝুপড়ি ছেড়ে পালিয়েছে কাঠুরেরা।"

ঝুপড়িগুলো কাঠুরেদের অস্থায়ী আবাস। কাঠ কাটতে এসে কাঠুরেরা আশ্রয় নেয়। স্থায়ী ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে না। হাতিদের যাতায়াতের পথে অবস্থিত বলেই হয়তো রাজরুখ গ্রামে স্থায়ী ঘরবাড়ি গড়ে ওঠেনি। অস্থায়ী ঝুপড়িগুলোর মাঝখানে অবশ্য একটি বাংলোছাঁদের বাড়ি আছে। শিকার করতে এসে ভুটানের রাজা এখানে বিশ্রাম করেন। একটানা চার ঘণ্টা ধরে পথ চলার পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ওই বাংলোর মধ্যে বিশ্রাম করার ইচ্ছে হল আমাদের। কিন্তু দাশো বাধা দিয়ে বললেন, "রাজার বিশ্রামগৃহে বিশ্রাম করার অধিকার রাজা ছাড়া আর কারও নেই। কাজেই এগিয়ে চলো..."
এগিয়ে যেতে-যেতে পৌঁছলাম আমরা পাবজিখাঁও। কিন্তু এখানে পৌঁছতেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল। টঙ্কাবাহাদুর বললে, "আর এগিয়ে যাওয়া চলবে না, এখানেই রাত কাটাতে হবে।"
রাজরুখের মতো পাবজিখাঁওতেও কাঠুরেদের ঝুপড়ি আছে কয়েকটি। তার মধ্যে থেকে তিনটে বেছে নিয়ে আমরা রাত কাটালাম টঙ্কাবাহাদুরের রান্নাকরা খিচুড়ি ও ডিমভাজা খেয়ে।
পরদিন ভোরে জ্যাম-রুটি ও কফি খেয়ে আমরা যাত্রার উদ্যোগ করছি, এমন সময় বন থেকে বেরিয়ে এল কয়েকটা বাচ্চা হাতি। টঙ্কাবাহাদুর বললে, "সাবধান, বাচ্চাদের মায়েরা কাছেই আছে, এখনই এসে হাজির

দাশো বললেন, "এরা আমাদের পথ জুড়ে দাঁড়াল যে । তাড়িয়ে দাও..."
বলে তিনি নিজেই তেড়ে গেলেন তাদের দিকে ।
সঙ্গে-সঙ্গে তেড়ে এল একজোড়া হস্তিনী ও একটি দাঁতাল হাতি । পাশের বন ফুঁড়ে বেরিয়ে এল তারা ।
"সর্বনাশ !" দাশো আঁতকে উঠে বললেন, "এখন পালাতে হবে আমাদের..."
"না ।" বলে টঙ্কাবাহাদুর হাতিদের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক ছাড়ে হাতির ডাকের অনুকরণে । সঙ্গে-সঙ্গে থমকে দাঁড়ায় তারা ।
টঙ্কাবাহাদুর বললে, "মনে হচ্ছে ওরা আমাকে বন্ধু বলে মেনে নিয়েছে, আপনারা ওদের বুঝিয়ে দিন যে, আপনারা আমার বন্ধু ।"
হতবুদ্ধির মতো হাতির পালের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে দাশো বললেন, "কী করে বুঝিয়ে দেব ? তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে ?"
"আমার মতো ময়লা জামা-কাপড় পরে নিন, আপনারা যে আমারই মতো একজন সাধারণ মানুষ তা বুঝতে দিন ওদের..."
এই হাতির পালকে অনুসরণ করি আমরা । ঘন বন পথকে পুরোপুরি চাপা দিয়েছে, হাতির পাল আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় । সেদিন সন্ধের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাই জলশিথুঙ্কা । তিনটি পাহাড় এখানেই এসে মিলেছে । এখানে পৌঁছেই হাতির পাল উধাও হয়ে যায় ঘন বনের মধ্যে ।
বনবিভাগের পরিত্যক্ত বিশ্রামগৃহ ছিল একটি পাহাড়ের মাথায়, আমাদের সকলের ইচ্ছে সেখানেই রাত কাটাই, কিন্তু টঙ্কাবাহাদুর বললে, "রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চলতে হবে, কারণ দিনের আলোয় এখানে পথ চলতে পারব না ।"
"কেন ?" দাশো প্রশ্ন করেন ।
"ওরা আমাদের যেতে দেবে না । ওদের এলাকার মধ্যে আমাদের অনধিকার প্রবেশ ওরা সইতে পারবে না ।"
"ওরা কারা ?"
"যাদের এলাকার মধ্যে এসে পড়েছি আমরা ।"
"কিন্তু ওরাই তো আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে ।"
"ওরা আমাদের নিয়ে এলেও ওদের পাহারাদাররা তাড়াবে আমাদের ।"
জলশিথুঙ্কা থেকে উত্তরদিকে দোরোনার দিকে যাই আমরা । ঘন বন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও পথটা আলোকিত হয়ে আছে । আমার মনে হল, পথের ওপরে কোনও

বাচ্চাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিচ্ছে মা-হাতি

স্বয়ংপ্রভ ছত্রাক গজিয়েছে, তা থেকে বিকীর্ণ আলো পথটাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে । পথ চলতে কোনও অসুবিধে হয় না, খাড়া চড়াই বেয়ে উঠতে অবশ্য কষ্ট হচ্ছে ।
চড়াই যখন শেষ হল, তখন ভোর হয়ে এসেছে । টঙ্কাবাহাদুর বললে, "আমরা দোরোনা পাহাড়ের মাথার ওপর এসেছি । এই সেই জায়গা ।
"হাতির দাঁতের পাহাড় কই ?" দাশো উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করেন ।
"খুঁজে বের করতে হবে । বাবার কাছে শুনেছি, এখানেই কোথাও আছে হাতির গোরস্থান, সেখানে হাতির দাঁত জমে-জমে পাহাড়ের আকার নিয়েছে ।"
শিবচৈতন্য অবাক হয়ে বললে, "হাতিদের গোরস্থান মানে ! মৃতদেহ গোর দেয় নাকি হাতিরা ?"
"তারা তো মানুষ নয় যে, মৃতদেহ গোর দেবে ।" টঙ্কাবাহাদুর বললে, "মরার সময় হলে তারা বিশেষ একটি জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ে..."
বন এখানে খুব গভীর । লাম্পাতি পানিসাজ, ময়না প্রভৃতি গাছের ফাঁকে-ফাঁকে দুর্ভেদ্য বাঁশ ও ঘাসের বন । এমন বড় আকারের ঘাস আগে কখনও দেখিনি, ঘাসবনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে গিয়ে ঘাসের মধ্যে ডুবে যাই আমরা । ঘাস ও বাঁশবন ঠেলে এগিয়ে যেতে-যেতে একটি নালার ধারে এসে দাঁড়ালাম । দু'পাশে গাছপালা ও লতাঝোপের ঘন জঙ্গল যেন দুর্ভেদ্য পাঁচিল তৈরি করেছে ।
টঙ্কাবাহাদুর বললে, "দাঁড়াচ্ছেন কেন, এগিয়ে চলুন..."
"এগিয়ে আর যাব কোথায় ?" দাশো বললেন, "জঙ্গল যেন আমাদের টুঁটি টিপে ধরছে !"
"নালার ধার ধরে চলুন..."
কিছুদূর নালা চওড়া হয়ে শ্যাওলা ও কাদায় ভরা পুকুরে পরিণত হয়েছে । পুকুরের পর নালার কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না । বোধ হয় নালার গতিপথে ধস নেমে নালাটাকে লোপ করে এই পুকুর সৃষ্টি করেছে ।
কাদা ও শ্যাওলায় ভরা পুকুরটির দিকে তাকিয়ে তার মধ্যে দু-তিনটি ভাসমান স্তূপ দেখতে পেলাম । আমার মতো আর সকলেও তাদের দেখতে পেয়েছে । টঙ্কাবাহাদুর বললে, "ওগুলো মরা হাতি । এখন বুঝতে পারছেন তো, এই হল হাতিদের গোরস্থান !"
মৃদু হেসে প্রণব বললে, "কথায় বলে মরা হাতির দাম লাখ টাকা, কিন্তু এদের কোনও দামই নেই ।"
নারায়ণ প্যাটেল বললেন, "দাম থাকবে না কেন ? এদের মধ্যে দুটো বড় দাঁতালো হাতি আছে । এরকম বড় আকারের দু' জোড়া হাতির দাঁতের দাম..."
"দাম যাই হোক, ওই কাদার মধ্য থেকে দাঁতগুলো উদ্ধার করে আনা অসম্ভব ব্যাপার । ওই কাদা চোরাবালির মতোই বিপজ্জনক, ওর মধ্যে পা দিলেই ডুবে যেতে হবে, ওর মধ্যে সাঁতার কাটা নিশ্চয়ই সম্ভব নয় । স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যু আসন্ন হলে এখানকার হাতিরা এই কাদার মধ্যে ডুবে আত্মহত্যা করে ।"
দাশো বললেন, "হাতির দাঁতের পাহাড় তো দেখছি না ! মরা হাতির দাঁত জমে-জমে পাহাড় তৈরি হওয়ার কথা বলছিল টঙ্কাবাহাদুর, কোথায় সেই পাহাড় ? এই দোরোনা পাহাড়ের মাথায় কোনও পাহাড় বা ঢিবি তো চোখে পড়ছে না ।"
প্রণব বললেন, "যা নেই তা চোখে পড়বে কী করে ! হাতির দাঁতের পাহাড় গল্পকথা ছাড়া আর কিছু নয় । হাতির দাঁত তার মৃতদেহের সঙ্গে পচে-গলে মাটিতে মিশে যায় । মরা হাতির দাঁত জমে-জমে পাহাড় তৈরি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার । এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নারায়ণ প্যাটেলের মতো হাতির দাঁতের কারবারিরা হাতির দাঁত পায় কোথা থেকে ? এর উত্তর,

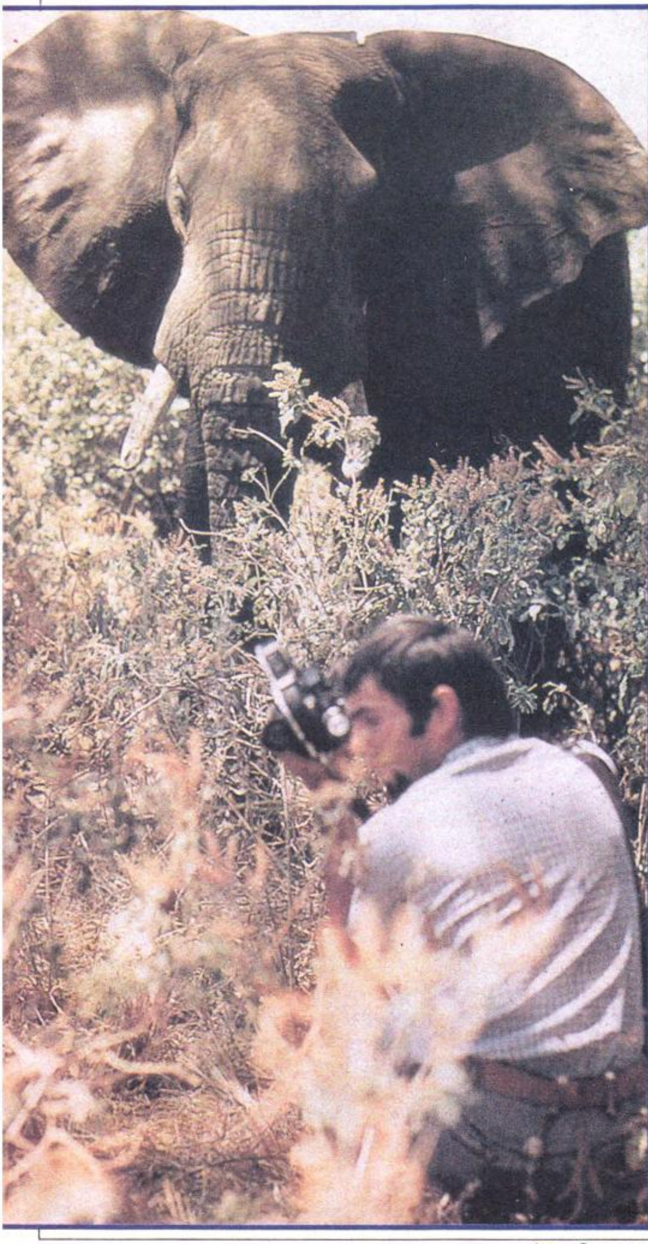

শিকারিদের কাছ থেকে। শিকারিরা হাতি শিকার করে তার দাঁত কেটে নিয়ে নারায়ণ প্যাটেলের মতো কারবারিদের কাছে বিক্রি করে।"

টঙ্কাবাহাদুরের মুখের ওপর অগ্নিদৃষ্টি হেনে দাশো বললেন, "তুমি ধোঁকা দিয়েছ?"
"আমি তো ধোঁকা দিইনি।" মুখ কাঁচুমাচু করে টঙ্কাবাহাদুর বললে, "হাতির দাঁতের পাহাড়ের কথা আমি আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছিলাম, বাবা শুনেছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে..."
"তুমিই বা আমাদের নিয়ে এলে কেন এখানে?" প্রণবের মুখের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাশো প্রশ্ন করেন, "তুমি যখন জানতে যে, হাতির দাঁতের পাহাড় সম্ভব নয়..."
"আমি তো আপনাদের আনিনি। আপনারা নিজেরাই এসেছেন।" প্রণব জবাব দিলেন, "নারায়ণ প্যাটেল ভেবেছিলেন হাতির দাঁতের পাহাড় পেয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকার মুনাফা লুটবেন। আমি অবশ্য এসেছি আমার নিজের কর্তব্যের প্রেরণায়। এখানকার বনের খবর নেওয়ার জন্য। পরে আবার আসব। টঙ্কাবাহাদুর, চলো ফিরে যাওয়া যাক..."
কিন্তু টঙ্কাবাহাদুরকে অনুসরণ করে আমরা ফিরে যাওয়ার উপক্রম করতেই বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা হাতিরা সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে আলোড়ন শুরু হল আমাদের চারপাশে বনের মধ্যে, বন ফুঁড়ে বেরিয়ে এল প্রায় এক ডজন হাতি, এদের মধ্যে কয়েকটি দাঁতাল হাতি ছিল। তাদের দাঁতগুলোর দাম নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো মনের অবস্থা ছিল না নারায়ণের। দাঁত উঁচিয়ে তারা তেড়ে আসতেই ভয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন।
সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে টঙ্কাবাহাদুর, "দেওকালি, দেওকালি..."
টঙ্কাবাহাদুরের ডাক শুনে সাড়া দেয় আমাদের ঘিরে থাকা হাতির দলের মধ্যে একটি হস্তিনী। শুঁড় তুলে সে ডেকে ওঠে।
"এই আমার দেওকালি," বলে তার দিকে ছুটে যায় টঙ্কাবাহাদুর!
তারপর শুঁড় তুলে দেওকালি কী ইশারা করল কে জানে, হাতির দল উধাও হয়ে গেল বনের মধ্যে। টঙ্কাবাহাদুরের গায়ে বারকয়েক শুঁড় বুলিয়ে দেওকালিও অনুসরণ করল তাদের। আর কোনও বিঘ্ন ঘটেনি আমাদের ফেরার পথে। বন্য হাতির দল থেকে দেওকালিকে উদ্ধার করতে পারেনি বলে টঙ্কাবাহাদুরের কোনও দুঃখ হয়েছে বলে মনে হল না।

দেশের নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও প্রশাসনের এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, যার খোঁজখবর সচরাচর সবাইকে জানানো হয় না। অথচ এইসব খবর জানার জন্য বিভিন্ন দেশ থাকে উন্মুখ। অন্য দেশ কী করছে, বা কী করতে যাচ্ছে তা আগাম জানা থাকলে তারা সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়। গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহের জন্য তারা নিয়োগ করে গুপ্তচর। সব্যসাচী সরকার লিখেছেন এই

গুপ্তচরদের গোপন কথা

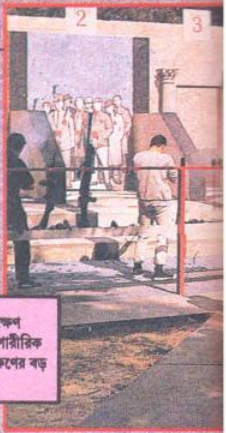

গুপ্তচরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। শারীরিক সক্ষমতাই প্রশিক্ষণের বড় কথা।

গুপ্তচরদের কাজটা খুব ঝুঁকির। মহিলা-গুপ্তচরদেরও রেহাই নেই। প্রাণভয়ে তাদেরও পালাতে হয়।

ধরা পড়ে গেলে শত্রুপক্ষ ছেড়ে কথা বলে না। সব অবস্থার জন্যই প্রস্তুত থাকতে হয় গুপ্তচরদের।

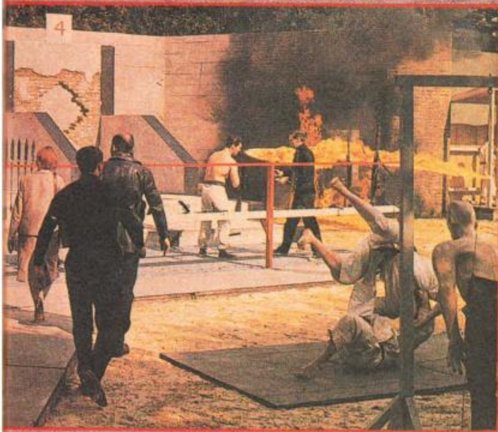

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে জেম্‌স বন্ডের অবাধ বিচরণ । শত্রুকে নাজেহাল করতে তার জুড়ি নেই ।

আগুন হাতে এ এক বিপজ্জনক খেলা । এরকম কত খেলাই না তাদের খেলতে হয় ।

আকাশ থেকে ঝাঁপ দিয়ে শত্রুর দেশে নামছে গুপ্তচররা । আকাশে ও মাটিতে তাদের সমানভাবে দিতে হয় সাহসের পরিচয় ।

আকাশপথে উধাও গুপ্তচর । বন্ড সিরিজের ছবিতে দেখা যায় এ ধরনের বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা ।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না জিমি । জিমি বোজার্ট । আমেরিকার ব্রুকলিন শহরে খবরের কাগজ বিক্রি করে দিন চলে জিমির । অন্যান্য দিনের মতোই কাজ সেরে ফস্টার অ্যাভিনিউ ধরে বাড়ি ফিরছিল সে । হাতে ছিল সেদিনের রোজগার করা বেশ কিছু পয়সা । এমন সময় ঘটল ঘটনাটা । হাত থেকে একটা পয়সা টুপ করে মাটিতে পড়ল । আর কী আশ্চর্য, পড়েই শক্ত নিকেলের পয়সাটা দু' ভাগ হয়ে গেল । জিমি তো হতভম্ব । ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি ? কিংবা ম্যাজিক ? তবে কি অচল পয়সা দিয়ে কেউ তাকে ঠকাল ? ভাবতে-ভাবতে সাহস করে ভাগ হওয়া টুকরো দুটো তুলে দেখতে লাগল জিমি । এবার আরও অবাক হওয়ার পালা । পয়সাটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল লুকনো একটা সরু ফিল্ম । ফিল্মটার ওপর

কিছু সংখ্যা আবার পর পর সাজানো আছে। সংখ্যাগুলো অবশ্য ম্যাগনিফাইং গ্লাস ছাড়া পড়া অসম্ভব। জিমির এক বন্ধুর বাবা পুলিশে কাজ করতেন। পয়সার টুকরো দুটো নিয়ে ভয়ে-ভয়ে জিমি ছুটল তাঁর কাছে। তিনি সব দেখেশুনে টুকরো দুটো জমা দিলেন আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (এফ বি আই) কাছে। শুরু হল তদন্ত। কী আছে ওই লুকনো ফিল্মে ? পরিশ্রম বিফলে গেল না। শেষপর্যন্ত ওই ফিল্ম এবং অন্যান্য সূত্রের ভিত্তিতে মার্কিন গোয়েন্দারা আবিষ্কার করলেন এক গুপ্তচরচক্র। ধরা পড়লেন গুপ্তচর সংস্থার কর্নেল রুডল্‌ফ আবেল। তিরিশ বছরের জন্য সুদূর আটলান্টায় নির্বাসিত হলেন তিনি। প্রকাশ পেল চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। জানা গেল আর কিছুদিন আবেল বিনা বাধায় কাজ চালিয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যেত আমেরিকার। ১৯৫৩ সালের ২২ জুন জিমির হাত থেকে ওই নিকেলের পয়সা যদি না পড়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে পারত।

প্রাচীনকালের গুপ্তচরবৃত্তি

কবে থেকে শুরু হয়েছিল গুপ্তচরবৃত্তি ? গোপন খবর জানবার এবং জানাবার এই পেশাটির উৎপত্তি কবে ? বাইবেলের ওল্ড

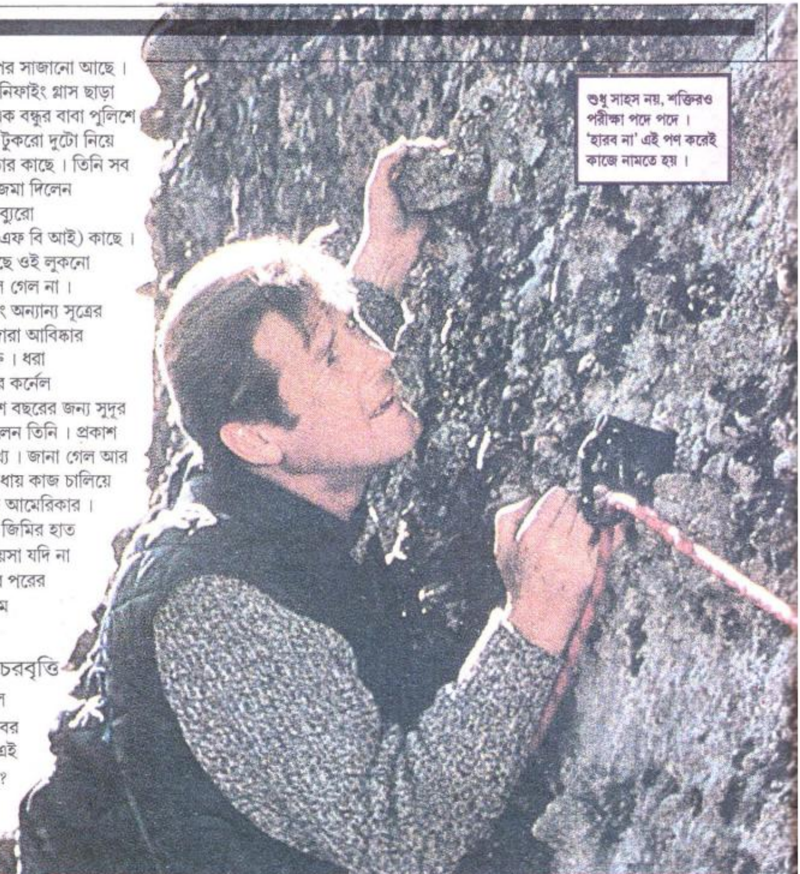

শুধু সাহস নয়, শক্তিরও পরীক্ষা পদে পদে। 'হারব না' এই পণ করেই কাজে নামতে হয়।

জেম্‌স বন্ড চরিত্রে অভিনয় করে বিখ্যাত হয়েছেন সন কোনারি। বন্ড চরিত্রে অভিনয় করেই তিনি প্রথম প্রতিষ্ঠা পান।

জর্জ ল্যাজেনবি। 'অন হার ম্যাজেস্টি'জ সিক্রেট সার্ভিস' ছবিতে ইনি অভিনয় করেন বন্ড চরিত্রে।

রজার মুর। ভারতে বন্ডের মাত্র একটি ছবির শুটিং হয়েছে— 'অক্টোপুসি'। এই ছবিতেও ইনি বন্ড।

টিমোথি ডালটন। বন্ড চরিত্রে ইনি চতুর্থ ও শেষ অভিনেতা। 'দ্য লিভিং ডেলাইট্‌স' ছবিতে ইনি জেম্‌স বন্ড।

টেস্টামেন্টের পাতা ওলটালে দেখা যায় আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মোজেস কান্নান প্রদেশে পাঠিয়েছিলেন বিশ্বস্ত বারোজন গুপ্তচরকে । গোপন খবর সংগ্রহে সফলও হয়েছিল তারা । যিশুখ্রিস্টের জন্মের এগারোশো বছর আগে সুন্দরী ডিলাইলা কৌশলে স্যামসন-এর কাছ থেকে বহু গোপন তথ্য বের করে ফিলিস্তিনকে সাহায্য করেছিলেন । স্যামসন আর ডিলাইলার গল্প ইতিহাসবিখ্যাত ।

আলেকজান্ডার তখন পৃথিবীজয় করতে বেরিয়েছেন । বেশ কিছু দেশ জয় করার পর ক্লান্ত সৈন্যরা আর যুদ্ধ করতে চাইল না । বুদ্ধিমান আলেকজান্ডার কিন্তু তাতে না দমে ঘোষণা করলেন, সৈন্যদের মধ্যে কেউ যদি দেশে চিঠি লেখে, লোক মারফত সে চিঠি তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে । সৈন্যরা তো তাই শুনে আহ্লাদে আটখানা । সবাই লম্বা-লম্বা চিঠি লিখে ফেলল । যথাসময়ে সম্রাটের লোক চিঠিগুলো নিয়ে গ্রিসের দিকে রওনা হয়ে গেল । চিঠি গ্রিসের দিকে যাওয়ার কথা বটে, কিন্তু আলেকজান্ডার তা হতে দিলেন না । গোপন জায়গায় সবক'টি চিঠিই তাঁর হস্তগত হল । তিনি জেনে গেলেন সৈন্যবাহিনীর অভিপ্রায় । যুদ্ধকালীন সেন্সরশিপ বা সৈন্যবাহিনীর আত্মীয়স্বজনকে লেখা চিঠি পড়ে দেখার এই প্রথা আলেকজান্ডারই শুরু করেন । ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, রোমান সাম্রাজ্যেও গুপ্তচরদের রমরমা ছিল । সবচেয়ে বিখ্যাত রোমান গুপ্তচর ছিলেন লুসিয়াস ক্রাসাস ।

গুপ্তচরবৃত্তির খুঁটিনাটি

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে স্পাইং-এর পদ্ধতির ঘটে গেছে অনেক রকমফের । আধুনিক কালে স্পাইংকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায় । প্রথমটি হল 'হোয়াইট রিসার্চ' । কখনও-কখনও গুপ্তচরেরা তাঁদের হাতে আসা সবরকম বিদেশী নথিপত্রই পাচার করেন দেশে । এই নথিপত্রের অধিকাংশই অনেকসময় কোনও কাজে আসে না । কিন্তু মাঝে-মাঝে এদের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে পড়ে কোনও মহামূল্যবান তথ্য । কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া রুটিনমাফিক এই খবর পাঠানোর নামই হল হোয়াইট রিসার্চ । এই হোয়াইট রিসার্চকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সাবমেরিন 'ইউ-৫৩'-র ক্যাপ্টেন লেফটেনান্ট হ্যানস রোজ দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন । এবার দ্বিতীয় পদ্ধতির কথা । এই পদ্ধতিটির নাম 'ব্ল্যাক' বা 'আণ্ডারকভার ওয়ার্ক' । বলা বাহুল্য, প্রথমটির থেকে দ্বিতীয়টিতে ঝুঁকিও যেমন বেশি, সাফল্যের সম্ভাবনাও তেমনই । 'ব্ল্যাক অপারেশন'-এ সবকিছুই হয় পরদার আড়ালে, গোপনে । বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই এখন রয়েছে গুপ্তচরসংস্থা বা ইনটেলিজেন্স সার্ভিস । সব সংস্থার যেমন রয়েছে

গুপ্তচর যখন ডুবুরি

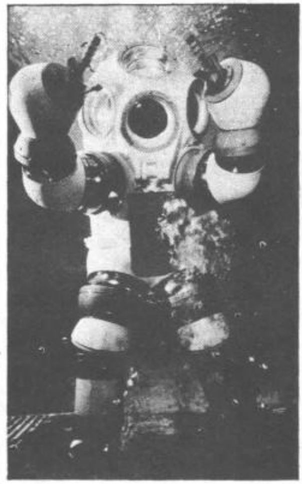

গুপ্তচরদের নিয়ে চলচ্চিত্রে দেখা যায় এরকম নানা চমক

ইনটেলিজেন্স এজেন্ট, তেমনই রয়েছে কাউন্টার ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের স্পাইরাও। কাউন্টার ইনটেলিজেন্স কী ? বিদেশী গুপ্তচরসংস্থা এবং তাদের চরদের কাজকর্ম ও গতিবিধির ওপর নজর রাখতে পালটা গোয়েন্দাসংস্থাকে বলে 'কাউন্টার ইনটেলিজেন্স'। গুপ্তচর-দুনিয়ায় প্রায়ই শোনা যায় 'ডিফেক্টর' শব্দটি। এই জগতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলে প্রচণ্ড রেষারেষি। বিরোধী দলের গুপ্তচরদের প্রায়ই প্রলোভন দেখিয়ে নিজের দলে টানার চেষ্টা চলে। এই ফাঁদে পা দিয়ে যেসব গুপ্তচর বিদেশী ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের হয়ে কাজ শুরু করেন তাঁদেরই বলা হয় ডিফেক্টর। সম্ভাব্য ডিফেক্টরদের ওপর কড়া নজর রাখা কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের প্রধান কাজ। যে স্পাইরা স্বেচ্ছায় বিদেশী রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করেন তাঁদের বলা হয় 'WALK-IN' এজেন্ট। সবচেয়ে বিপজ্জনক কিন্তু ডবল এজেন্টরা। দু' পক্ষের হয়েই খবর দেওয়া-নেওয়ায় এঁরা পটু। ধরা পড়ার সম্ভাবনা এঁদেরই সবচেয়ে বেশি। অবশ্য 'রেসিডেন্ট এজেন্ট'রাও একদম নিরাপদে থাকতে পারেন না। যেসব স্পাই বিদেশী রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে স্বদেশে নিয়মিত খবর পাঠান, তাঁরাই রেসিডেন্ট এজেন্ট। সে তুলনায় 'স্লিপার'-দের ব্যস্ততা অপেক্ষাকৃত কম। অনেক স্পাই বিদেশী রাষ্ট্রে অনির্দিষ্টকাল লুকিয়ে থেকে গোপন তথ্য পাচারের সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। এঁরা স্লিপার। যখন সুযোগ আসে কাজে নামেন স্লিপাররা। এরই নাম 'WAKE-UP'

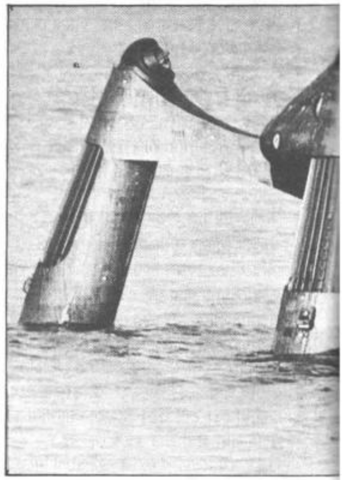

বন্ড সিরিজের 'দ্য স্পাই হু লাভড মি' ছবির গুপ্তঘাটি। এটি থাকে

বিদেশী রাষ্ট্রে কর্মরত স্লিপাররা অনেকসময় ধরা পড়ে যান। এঁদের তখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে বিদেশী রাষ্ট্র। স্লিপার থেকে এঁরা হয়ে যান 'কন্ট্রোলড এজেন্ট'।

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে স্পাইংয়ের কাজে যেমন বেড়েছে ঝুঁকি ও বিপদ, তেমনই বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে গোপন খবর জানার অনেক অভিনব পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছে। সফল গুপ্তচরবৃত্তির তিনটি ধাপ আছে। একজন স্পাই যেখান থেকে খবর জোগাড় করেন, তাকে বলা হয় 'টার্গেট'। এই টার্গেট খুঁজে বের করাটা হল প্রথম ধাপ। একে বলে 'প্রেসিং'। দ্বিতীয় ধাপ হল 'গ্যাদারিং'। কাজটা কিন্তু মোটেই সোজা নয়। টার্গেট সম্বন্ধে সবরকম খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করা হল গ্যাদারিংয়ের অন্যতম অংশ। এই ধাপে প্রতি পদেই রয়েছে বিপদের হাতছানি। বিপদ রয়েছে ঠিকই, রোমাঞ্চও কম নেই। খবর জোগাড় করার জন্য একই দিনে তিন-চারবার বিভিন্ন ছদ্মবেশে বিভিন্ন নামে কাজ করতে হতে পারে। শুধু সাহসই নয়, দরকার উপস্থিত বুদ্ধি আর আত্মবিশ্বাসের। একটা ছোট্ট ভুল একটা গোটা দেশের সর্বনাশ করে দিতে পারে এটা মাথায় রেখে গুপ্তচরদের কাজ করতে হয়। আত্মরক্ষার জন্য সবসময় সঙ্গে রাখতে হয় নানা অস্ত্রশস্ত্র। বেশিরভাগ স্পাই আত্মহত্যার জন্য পকেটে রাখেন পটাশিয়াম সায়ানাইড ট্যাবলেট। গ্যাদারিংয়ের পালা চুকল। আসল কাজটাই বাকি।

আকাশে গুপ্তচর

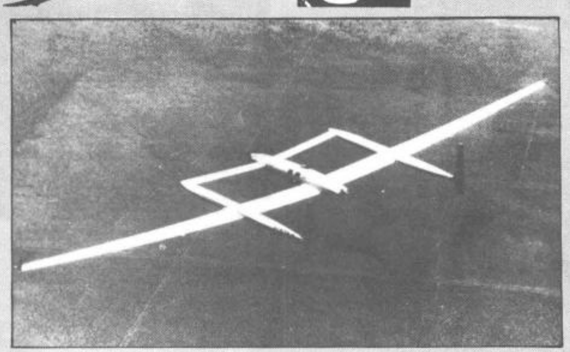

স্পাই-প্লেন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির জন্যই সম্ভব হয়েছে আকাশে স্পাইং। আকাশপথে গোপন খবর আনার জন্য বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলিতে আছে বিশেষভাবে তৈরি বিমান ও স্যাটেলাইট। এই বিমানগুলোয় থাকে অত্যাধুনিক টেলিস্কোপিক ক্যামেরা। বিরোধী দেশে উড়ে গিয়ে তাদের গোপন ঘাঁটির ছবি তুলে আনেন গুপ্তচররা। ছবিগুলোই অজানা তথ্যের জানান দেয়। উড়ে গিয়ে ছবি তুলে আনার কাজটা শুনতে যত সহজ, করতে ততই কঠিন। ঝুঁকি থাকে প্রচুর। কখনও-সখনও ঘটে যায় বড়রকমের দুর্ঘটনা। শুধু ক্যামেরাই নয়, কিছু বিমানে থাকে 'ডাস্ট অ্যারেস্টার', যা শত্রুরাষ্ট্রে ওড়ার সময় হাজার-হাজার ফুট ওপরের ধুলো সংগ্রহ করে। এই ধুলো কিন্তু হেলাফেলার জিনিস নয়। ওই ধুলোর 'রেডিওঅ্যাকটিভ অ্যানালিসিস' করে জানা যায় কোনও দেশ পারমাণবিক বোমা বানাচ্ছে কি না।

খবর পাওয়ার জন্য ১৯৬০ সাল থেকে আমেরিকার বড় হাতিয়ার 'এরিয়াল স্পাইং'। দুই রকমের প্রধান স্যাটেলাইট আছে মার্কিনদের। প্রথমটির নাম MIDAS (মিসাইল ডিফেন্স অ্যালার্ম সিস্টেম)। ১৯৬০-এর ২৪ মে একে প্রথম আকাশে তোলা হয়। দ্বিতীয়টি হল SAMOS (স্যাটেলাইট অ্যান্ড মিসাইল অবজারভেশন সিস্টেম)। ১৯৬১-র ৩১ জানুয়ারি SAMOS প্রথম পাড়ি দেয় আকাশে।

জলের নীচে

কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ। ঠিকমতো খবর পাচার করতে না পারলে সব পরিশ্রমই বৃথা। খবর পাঠানোর জন্য গোপন রেডিও ট্রান্সমিটার থাকে প্রায় সবার কাছেই। ট্রান্সমিটারগুলিতে থাকে বিশেষ 'সিকিউরিটি চেক'। এর মাধ্যমে বোঝা যায় রেডিও ট্রান্সমিটারটি শত্রুপক্ষের হাতে পড়েছে কি না। শত্রুপক্ষ যাতে রেডিওটি প্লে-ব্যাক করে অজানা খবর না জেনে ফেলে সেইজন্যই এই বিশেষ সতর্কতা। খবর পাঠানো হয় বিশেষ সার্ভিসের মাধ্যমেও। খবর পাঠানোর আরও হরেকরকম পন্থা গুপ্তচররা ব্যবহার করে থাকেন। এই কাজটা হয় খুব সাবধানে, কারণ একবার ধরা পড়লে মিথ্যে কথা বলে বাঁচা যায় না। আজকাল প্রায় সব গুপ্তচরসংস্থারই রয়েছে 'লাই ডিটেক্টর'। কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে নিমেষে ধরে ফেলে এই আশ্চর্য যন্ত্র।

মহিলা গুপ্তচর

সাহসী এবং সফল মহিলা গুপ্তচরদের সংখ্যা ইতিহাসে কম নয়। কথায় বলে স্পাইংয়ে মেয়েদের জুড়ি নেই। বাইবেলে জেরিকোর এক মহিলা গুপ্তচরের কথা পাওয়া যায়। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় চোদ্দ শতাব্দী আগে তিনি জোসুয়ার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করেছিলেন। আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসেও বহু মহিলা নানা সময়ে চরগিরিতে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এমনই একজন হলেন লিডিয়া ডারা। জর্জ ওয়াশিংটনের সেনাবাহিনীকে তিনি নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। ইংরেজরা ফিলাডেলফিয়ার কাছে মার্কিনি সৈন্যদের অতর্কিতে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল। খবরটা আগেভাগেই মার্কিনিদের জানিয়ে দেন লিডিয়া।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধে সফল গুপ্তচরদের অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন রোজ গ্রিনহাউ নামে ওয়াশিংটন নিবাসী এক মহিলা। তবে বুদ্ধি ও সাহসে শ্রীমতী গ্রিনহাউকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন এম্মা এডমন্ডস। এম্মা ছিলেন শিক্ষিতা নার্স। তখন আমেরিকা ছিল পরাধীন। পরাধীনতা ও দাসত্বের প্রতি ঘৃণা থেকেই এম্মা বেছে নিয়েছিলেন দেশের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির কাজ। ঘোড়ায় চড়তে ও গুলি চালাতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

গৃহযুদ্ধের সময় অন্তত এগারোবার বিভিন্ন ছদ্মবেশে দারুণ ঝুঁকি নিয়ে খবরের জন্য তিনি শত্রুশিবিরে হানা দিয়েছিলেন। এবং সফল হয়েছিলেন প্রতিবারই। জীবনের প্রথম অভিযানে এম্মা সেজেছিলেন এক নিগ্রো যুবক। কামানো মাথায় কালো পরচুলা, চামড়া কালো করার জন্য সারা গায়ে কুচকুচে কালো রং, অপরিষ্কার পোশাক। সাজ এতই নিখুঁত হয়েছিল যে, পরিচিতজনেরাও এম্মাকে চিনতে পারেননি। বিভিন্ন যুদ্ধে অসুস্থ মার্কিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাশুশ্রূষাতেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন।

বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত মহিলা গুপ্তচর বলতে মাতাহারি ছাড়া কাউকে ভাবাই যায় না। মাতাহারির আসল নাম ছিল মার্গারেট গার্টরুড ম্যাকলিয়ড। জাতে ডাচ হলেও তিনি বলতেন, "আমি ভারতের দক্ষিণে মালাবার উপকূলের পবিত্র জাফনাচাটনম শহরে জন্মেছি।" আসল ঘটনা কিন্তু তা নয়। ১৮৭৬ সালের ৭ অগস্ট হল্যান্ডের লুইভারদেন

চরবৃত্তির অভিযোগে আর্থার ওয়াকারকে নরফোকের আদালত তিন তিনবারের যাবজ্জীবন, সঙ্গে আরও ৪০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল।

ইংল্যান্ডের রানির প্রাক্তন শিল্প-উপদেষ্টা অ্যান্টনি ব্লান্ট চরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এই ঘটনা বেশ শোরগোল তুলেছিল।

শহরে মাতাহারির জন্ম হয়। মাতাহারি প্রাচ্যদেশীয় জাভানিজ নাচে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এই নাচই হয়ে উঠেছিল তাঁর চরগিরির প্রধান অস্ত্র। ১৯০৫ সালে প্যারিসে মাতাহারি প্রাচ্য নাচ দেখাতে শুরু করেন। নাচের সুবাদে তাঁর পরিচয় হল উচ্চমহলের বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হলে বহু কাঠখড় পোড়াতে হত। জনপ্রিয়তা ও প্রতিপত্তিকে ভিত্তি করে নর্তকী মাতাহারি কিন্তু যখন খুশি যে-কোনও দেশে চলে যেতেন। জার্মান ইনটেলিজেন্স সার্ভিস এই সুবিধেটাকে কাজে লাগাল। জার্মানদের অনুরোধে মাতাহারি শুরু করলেন গুপ্তচরবৃত্তি। তাঁর সাঙ্কেতিক নাম হল H-21. শুরু হল গোপনে খবর সংগ্রহ। ফ্রান্সে একসময় ধরাও পড়লেন। কিন্তু ফরাসি সিক্রেট সার্ভিসকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে যাত্রা বেঁচে গেলেন মাতাহারি। আবার চলল দুঃসাহসিক স্পাইং। ফ্রান্স থেকে বেলজিয়াম, বেলজিয়াম থেকে ইংল্যান্ড। ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েও আবার সুকৌশলে নিজেকে মুক্ত করলেন। আবার যোগাযোগ করলেন জার্মানদের সঙ্গে। কিন্তু ভাগ্য আর তাঁকে সাহায্য করল না। এবার ধরা পড়লেন ফরাসিদের হাতে। ১৯১৭ সালের ২৪ জুলাই বিচার শুরু হল তাঁর। স্পাইংয়ের অপরাধ প্রমাণিত হল। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল এজেন্ট H-21-কে। অক্টোবরের এক শীতের সকালে ফায়ারিং স্কোয়াডে পর পর বারোটি গুলি ঝাঁঝরা করে দিল প্রথম মহাযুদ্ধের সবচেয়ে বিখ্যাত গুপ্তচরের শরীর কোনও মহিলা গুপ্তচরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘটনা ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথম। কিন্তু সত্যিই কি গুপ্তচর ছিলেন মাতাহারি? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গোপন ফাইলপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে যে, বহুবারই গোয়েন্দা সংস্থাগুলি স্রেফ সন্দেহবশত মাতাহারিকে গ্রেফতার করেছিল। প্রকৃত অর্থে মাতাহারি গুপ্তচর ছিলেন কিনা এ নিয়ে মতভেদ আছে।

কয়েকজন গুপ্তচরের কাহিনী

গুপ্তচরেরা বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর ইতিহাস পালটাতে বড় ভূমিকা নিয়েছে। ফরাসি বিপ্লবই হোক বা আমেরিকার গৃহযুদ্ধই হোক, সবকিছুতেই গুপ্তচররা ছিল সক্রিয় অংশীদার। ফরাসি বিপ্লবের সাফল্য পৃথিবীর ইতিহাসে একটা মাইলস্টোন। রাজার অজ্ঞাতসারে বিপ্লবের প্রস্তুতি চলত পুরোদমে, আর এই কাজে লাগানো হত প্রচুর গুপ্তচরকে। ফরাসি বিপ্লবের উল্লেখযোগ্য গুপ্তচরদের মধ্যে হেরন, লেকক্লার্ক প্রমুখ। বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর যুদ্ধের পরিকল্পনা ও গতিবিধি সম্বন্ধে খবর পাওয়ার জন্য ফ্রান্সের বিরোধী রাষ্ট্রগুলি, বিশেষত ইংরেজরা অনেক গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিল। বুদ্ধিমান নেপোলিয়ন এটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাঁরও ছিল কয়েকজন বিশ্বস্ত চর। এঁদের মধ্যে নেপোলিয়নের ডান হাত বলা হত সুলমাইস্টারকে। প্রতিটি অভিযানে সুলমাইস্টার তাঁকে গোপন তথ্য দিয়ে সাহায্য করতেন। নেপোলিয়নের বিজয়রথ থেমেছিল ওয়াটার্লু যুদ্ধে। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল ব্রিটিশ গুপ্তচর কর্নেল হার্ডিঞ্জের। তিনি যুদ্ধের আগেই নেপোলিয়ন শিবিরের কিছু অত্যন্ত গোপন খবর সংগ্রহ করেছিলেন।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় আমেরিকা ও ইংল্যান্ড, দুই দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে একাধিক গুপ্তচর নিয়োগ করেছিল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ্যারি ডেভিস, টাউনসেন্ড, জন হ্যানিম্যান, নাথান হেল প্রমুখ। গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাসে উইলিয়ম স্টাইবার এক গুরুত্বপূর্ণ নাম। জার্মানির এই গুপ্তচর পেশায় ছিলেন উকিল। উনিশ শতকের জার্মান রাজনীতিতে গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে স্টাইবার বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'ম্যান অব ব্লাড অ্যান্ড আয়রন' জেনারেল ডন বিসমার্কের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন স্টাইবার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল ১৯১৪ সালে। সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হল গুপ্তচরদের ব্যস্ততাও। দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল ইনটেলিজেন্স

স্পাই টাওয়ার

মানুষ গুপ্তচরের কথা তো অনেকেই জানি, কিন্তু স্পাই টাওয়ারের কথা! ইতালিতে কিন্তু সত্যিই এরকম একটি টাওয়ার আছে, একে বলা হয় 'স্পাই অব ইতালি'। ইতালির উত্তরে সমভূমি অঞ্চলে ছোট্ট একটি পাহাড়ের ওপর সলফেরিনো গ্রাম। এই গ্রামের পাশেই গার্দা হ্রদ। এই গ্রামেই রয়েছে স্পাই টাওয়ার। এই টাওয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গুপ্তচরদের মতো নজর রাখা যায় বলে একে বলা হয় স্পাই অব ইতালি।

শত্রুকে নাস্তানাবুদ করতে এই গাড়িতে আছে নানান ব্যবস্থা। এমনকী আছে ক্ষেপণাস্ত্রও

এজেন্টরা। এঁদের পাঠানো খবরের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হত যুদ্ধের পরিকল্পনা। জার্মানির গুপ্তচরবাহিনীকে ঢেলে সাজানো হয় এই সময়। নেতৃত্বে ছিলেন দক্ষ গুপ্তচর গুস্তাভ স্টাইনওয়ার। আমেরিকার খবর আনার দায়িত্ব দেওয়া হল রিনটেলিনকে। আর মাতাহারি তো ছিলেনই। বিখ্যাত জার্মান গুপ্তচরদের মধ্যে আরও ছিলেন প্রাগমুলার ও ক্রফোর্ড গিলবার। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয় হলেও জার্মানরা দমে গেল না। নাৎসি বাহিনীর নেতা অ্যাডলফ হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানরা ঘুরে দাঁড়ানোর কাজ শুরু করল। জার্মান ইনটেলিজেন্স সার্ভিস সক্রিয় হয়ে উঠল। জার্মান গুপ্তচর সংস্থার প্রধান ওয়াল্টার উইলহেল্‌ম কানারি নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে হিটলারের বিশ্বাস অর্জন করলেন। আকর্ষক ব্যক্তিত্বের অধিকারী কানারি সাধারণ লেফটেন্যান্ট কমান্ডার থেকে শুরু করে উন্নতি করতে-করতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হয়ে ওঠেন গুপ্তচরবাহিনীর প্রধান। নাৎসিবাহিনীর হয়ে কাজ করলেও তিনি তাদের হিংস্র নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। ১৯৩৮ সালে তিনি সামরিকবাহিনীর প্রধান জেনারেল লুড্‌উইগ বেবোর সঙ্গে মিলে হিটলারের অপসারণের পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, বিদ্রোহের আগেই মিউনিখে হিটলার মিলিত হলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিনের সঙ্গে। সাময়িকভাবে শান্তি স্থাপিত হল। ১৯৩৯-এ হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণের সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধ চলাকালীন নিয়মিত মিত্রশক্তির দেশগুলিকে তথ্য সরবরাহ করতেন কানারি। হিটলার-স্তালিন চুক্তির কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন মিত্রশক্তিকে। শুধু তাই নয়, ১৯৪০ সালের ১০ মে জার্মানি যে ফ্রান্স আক্রমণ করবে সেটা ভ্যাটিকানের বেলজিয়ান রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে তিনি আগেই ফাঁস করে দিয়েছিলেন। কানারি এর পর আরও সাহসী হয়ে হিটলারকে হত্যার পরিকল্পনা করলেন। ১৯৪৩-এর মার্চে রাশিয়ার স্মোলেস্কে হিটলারের বিমানে রাখা হল একটি বোমা। দুর্ভাগ্যবশত বোমাটি ফাটল না। এতেও দমে না গিয়ে শেষ চালটি কানারি চাললেন ১৯৪৪-এর ২০ জুলাই। পূর্ব প্রাশিয়ার র‍্যাস্টেনবার্গে হিটলারের ফরেস্ট রিট্রিটে আবার রাখা হল বোমা। এবার বোমাটি ফাটল। কিন্তু যাঁকে মারার জন্য এত পরিকল্পনা, সেই হিটলার বেঁচে গেলেন আশ্চর্যভাবে। এই ঘটনার বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার হলেন কানারি। ন' মাস ধরে চলল অকথ্য অত্যাচার। অবশেষে ১৯৪৫-এর ৮ এপ্রিল ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হল কানারিকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত গুপ্তচর-কাহিনী অপারেশন নর্থপোলের সাফল্যের মূলে ছিল প্লে-ব্যাক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ। ১৯৪১ সাল। তখন হল্যান্ড জার্মানদের অধীনে। তিনজন ডাচ গুপ্তচর হল্যান্ডের হেগ থেকে গোপনে রেডিও ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে খবর পাঠাচ্ছিলেন দেশের চারদিকে। কিন্তু বেশিদিন জার্মানদের চোখে ধুলো দেওয়া গেল না। তাদের গুপ্তচর সংস্থার 'কমিউনিকেশন মনিটর'-এ ধরা পড়ল ওই ট্রান্সমিটারের সঙ্কেতবার্তা। আর যাবে কোথায়? রেডিওটির খোঁজে তোলপাড় শুরু হল। যে বাড়িটি থেকে খবর পাঠানো হচ্ছিল, সন্ধান পেয়ে সেটি ঘিরে ফেলল জার্মানরা। তিনজন এজেন্টের দু'জন পালাতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন আর তৃতীয়জন

জেম্‌স বণ্ডের স্রষ্টা ইয়ান ফ্লেমিং।

গুপ্তচর জেম্‌স বণ্ডের উপন্যাস যেমন জনপ্রিয়, তেমনই জনপ্রিয় বণ্ডের ছবিগুলি। এর মধ্যে রজার মুর অভিনয় করেছেন সাতটি ছবিতে। এখানে 'ফ্রম রাশিয়া উইদ লাভ' ছবির লোকেশনে দেখা যাচ্ছে ফ্লেমিংকে।

খুদে গুপ্তচর

বুদ্ধিতে ও সাহসে খুদে গুপ্তচররা অনেক সময়ই টেক্কা দিয়েছে বড়দের। ফ্রান্সের খুদে গুপ্তচর লিডিয়া লোভার কথাই ধরা যাক। কিশোরী লিডিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশের হয়ে একজন সক্রিয় গুপ্তচরের কাজ করত। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সে সংগ্রহ করে আনত মূল্যবান সব গোপন তথ্য। দুভর্গ্যিবশত লিডিয়া একসময় ধরা পড়ে যায় নাৎসিদের হাতে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে চার বছর ধরে অনেক অত্যাচার সইতে হয়েছিল তাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লিডিয়ার অবদানের কথা মনে রেখে ১৯৬০ সালে তাকে 'লিজিয়ন অব অনার' দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ততদিনে অবশ্য সে আর কিশোরী ছিল না, হয়ে উঠেছিল ফ্রান্সের বিখ্যাত নর্তকী লিডিয়া লোভা। খুদে ইংরেজ গুপ্তচর টেডারই বা কম যায় কিসে! তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। মিশরের কায়রোয় ব্যবসা করতে এসেছেন একদল প্রাচ্যদেশীয় বণিক। তাদের গতিবিধি দেখে সেখানের মার্কিন ও ইংরেজ গোয়েন্দারা সতর্ক হলেন। ওঁরা গুপ্তচর নয়তো? কিন্তু কীভাবে জানা যাবে যে ওঁরা গুপ্তচর, এই নিয়েই হল মুশকিল। ওই ব্যবসায়ীরা যে এশীয় ভাষায় নিজেদের মধ্যে গোপনে কথা বলতেন, তা ছিল মার্কিন গুপ্তচরদের কাছে দুর্বোধ। ব্রিটিশ এয়ার চিফ মার্শালের ছেলে টেডার এশিয়ার অনেক ভাষা জানত। তাকেই লাগানো হল কাজে। সত্যিই কিন্তু ছোট্ট টেডার মুশকিল আসান করল। এক হোটেলের লবিতে ব্যবসায়ীদের কথোপকথন থেকে সে সংগ্রহ করল অমূল্য কিছু তথ্য। দেখা গেল গোয়েন্দাদের সন্দেহই ঠিক। টেডারকে যখন তার কাজের জন্য কোনও পুরস্কার চাইতে বলা হল তখন সে কী চেয়েছিল জানো? একটা আট ডলার মূল্যের স্ট্যাম্প অ্যালবাম।

ছবি : দেবাশিস দেব

লাউয়ার্সও ধরা পড়লেন, কিন্তু তার আগে জানালা দিয়ে নীচে ফেলে দিলেন রেডিওটি। অবাক কাণ্ড ! রেডিওটি মাটিতে না পড়ে দুটি কাপড় শুকোতে দেওয়ার দড়ির মাঝে আটকে গেল। রেডিওটি হাতে আসার পর জার্মান কাউন্টার এসপিওনেজের প্রধান কর্নেল গিসক্স বুঝলেন যে, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে এই ট্রান্সমিটারটির সাহায্যে বোকা বানানো যেতে পারে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। লন্ডনের সঙ্গে জার্মান কর্তারা লাউয়ার্সের মাধ্যমে যোগাযোগ শুরু করলেন। অধিকাংশ ট্রান্সমিটারের মতোই লাউয়ার্সেরটিতেও ছিল 'সিকিউরিটি চেক'। নির্দেশ ছিল লাউয়ার্সের পাঠানো প্রতিটি খবরের ষোলোতম শব্দে যদি একটি বানান ভুল থাকে তা হলে লন্ডন ধরে নেবে যে, সব ঠিকঠাক চলছে। প্রাণভয়ে লাউয়ার্স মিথ্যা খবর পাঠানোর সঙ্গে-সঙ্গেই কথামতো প্রয়োগ করলেন সিকিউরিটি চেকটির। তা সত্ত্বেও ভাগ্য জার্মানদের সহায় হল। ব্রিটিশ রেডিও অপারেটরদের গাফিলতিতে উপেক্ষা করা হল বিপদসঙ্কেতগুলি। এর ফল হল মারাত্মক। জার্মানদের পাঠানো প্রতিটি খবরে বিশ্বাস করে ব্রিটিশরা পাঠাতে লাগল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রসদ। জার্মানদের কাজ হয়ে গেল জলের মতো সহজ। এরই নাম অপারেশন নর্থপোল। আঠারো মাস ধরে ব্রিটিশদের ইচ্ছেমতো চালিয়েছিল জার্মানরা। কমপক্ষে চুয়ান্নজন ডাচ গুপ্তচর ধরা পড়ল। ধ্বংস করে দেওয়া হল

শত্রুপক্ষের নাগাল এড়িয়ে

বারোটি চার এঞ্জিন বিশিষ্ট ব্রিটিশ বম্বার। অবশেষে জার্মানদের হাতে বন্দী পিটার ডোরলিন নামে এক অসমসাহসী ডাচ যুবক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জেল থেকে ইংল্যান্ডে খবর পাঠালেন, "অবিলম্বে লোক পাঠানো বন্ধ করুন। আমরা বন্দী। জার্মানরা সব কোড জেনে ফেলেছে।" এই খবর পাওয়া মাত্র ব্রিটিশরা তদন্ত থেকে জানতে পারল কীভাবে তারা প্রায় দু' বছর ঠকেছে। শেষ হল অপারেশন নর্থপোল। পিটার ডোরলিনের অসামান্য অবদানের জন্য আমস্টারডামের রয়েল প্যালেসে রানি জুলিয়ানা হল্যান্ডের সর্বোচ্চ সম্মানে তাঁকে ভূষিত করলেন।

কিংকং নামটা শুনলেই মনে পড়ে যায় সেই দানবাকৃতি গোরিলার কথা। কিংকং নামধারী এক গুপ্তচর ছিলেন। ক্রিশ্চিয়ান লিনডেমানসের আসল নামটাই ভুলে গিয়েছিল সবাই। তাঁর চেহারাটা সত্যিই ছিল গোরিলার মতো। ডাচ গুপ্তচর হিসেবে তিনি কাজ শুরু করেন ১৯৪০ সালে। ১৯৪৪ সালে জার্মানদের হাতে বন্দী ভাই ও বান্ধবীর মুক্তির বিনিময়ে তিনি জার্মানদের সবরকম গোপন তথ্য জানাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। যুদ্ধে মিত্রশক্তির কার্যকলাপ সম্বন্ধে যা তিনি জানতেন সবই জানিয়ে দিলেন জার্মানদের। ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি তিনি জার্মানদের দিলেন এক অমূল্য তথ্য। ব্রিটিশরা যে গোপনে ১৫ সেপ্টেম্বর প্যারাট্রুপারদের সাহায্যে হল্যান্ড আক্রমণ করবে এই খবর ফাঁস করে দিলেন কিংকং। প্যারাট্রুপাররা যে আর্নহেম নামে একটি জায়গায় নামবে, তাও জানালেন। নির্দিষ্ট দিনে ব্রিটিশ প্যারাট্রুপাররা মাটি ছোঁওয়ার আগেই তাদের বুলেট দিয়ে ঝাঁঝরা করে দিল জার্মানরা। সাত হাজার সৈন্য প্রাণ হারাল। মিত্রশক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বড় ধাক্কা খেল। জার্মানদের এই সাফল্যের সঙ্গেই শুরু হল কিং কংয়ের পতনের। শেষ পর্যন্ত ধরাও পড়লেন তিনি। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র কিং কংকে ধরতে এক ডজন সশস্ত্র সৈন্য হিমশিম খেয়ে গেল। স্টিলের তার দিয়ে তাকে হাতকড়া পরাতে হয়েছিল কারণ দানবাকৃতি কিংকংয়ের হাতের মাপের হাতকড়া তখন হল্যান্ডে পাওয়া যেত না। ধরা পড়ার আঠারো মাস পরে কুখ্যাত কিং কং বিচারের দু' দিন আগে আত্মহত্যা করলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আর-একটি উল্লেখযোগ্য গুপ্তচর কাহিনী হল 'অপারেশন সিসারো'। আঙ্কারার ইংরেজ রাষ্ট্রদূত হিউগসেনের পরিচারক এলিসা বাজনা মিত্রশক্তির বহু গোপন নথিপত্রের ফোটো কপি করে জার্মানদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এই বাজনা ছিলেন সিন্দুক ভাঙার দক্ষ কারিগর। জার্মানরা বাজনার ছদ্মনাম দিয়েছিল 'সিসারো'। অবশ্য তার পাঠানো কোনও খবরেরই বিশেষ মূল্য ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই গঠিত হয় আমেরিকার প্রথম স্থায়ী গুরুত্বপূর্ণ গুপ্তচরসংস্থা ও· এস· এস· (অফিস অব স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিসেস)। ও·এস·এসের প্রথম

কোড সিস্টেম

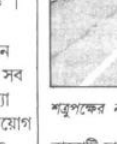

গুপ্তচর জগতে মুখে-মুখে ঘোরে 'কোড' শব্দটি। 'কমিউনিকেশন'-এর অন্যতম প্রধান ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হল 'কোড সিস্টেম'। 'কোড সাইফার' কী ? গোপন খবর পাঠানোর সময় খুবই সতর্ক থাকতে হয় গুপ্তচরদের। ব্যবহার করতে হয় সঙ্কেতবার্তা। সাধারণত, একটি শব্দের পরিবর্তে যদি কোনও নতুন শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাকে কোড বলে। কোডের প্রতিটি অক্ষর হল সাইফার। ধরা যাক, PELE শব্দটির বদলে 1231 সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 1231 পুরো সংখ্যাটি হল PELE শব্দটির কোড আর 1, 2, 3, 1 হল এক-একটি সাইফার। কোড সিস্টেম ছিল প্রাচীনকালেও। মিশর, গ্রিস, চিন প্রভৃতি দেশে অনেকদিন আগেও ব্যবহৃত হত কোড। এখন গুপ্তচররা যে কতরকমের কোড ব্যবহার করেন তার কোনও ইয়ত্তা নেই। বিজ্ঞানের হাত ধরে অনেক আধুনিক ও উন্নত হয়েছে কোড সিস্টেম। একটি সাধারণ কোডের উদাহরণ দেওয়া যাক। নীচে ইংরেজি বর্ণমালার ২৬টি অক্ষর পর পর সাজিয়ে তার ঠিক নীচে লেখা হল কোনও অক্ষর বা সংখ্যা। প্রত্যেকটি অক্ষরের নীচে যে সংখ্যা বা অক্ষর থাকবে, তাই হবে উপরের অক্ষরটির সঙ্কেত। অর্থাৎ A-এর নীচে P থাকলে A = P.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
KL2MNP3 79STVU4 1EFH6G 5C B8QY

এই কোড ব্যবহার করে এবার 'WE LOVE CRICKET' লেখা যেতে পারে BN/V1CN/2H92TNG.

কর্তা ছিলেন কর্নেল উইলিয়াম ডোনোভান। শুরু থেকেই বিতর্কিত এই সংস্থাটিকে অনেকে নানারকম ব্যঙ্গ করত। হ্যাঁ, ও-এস-এস অনেক সময় ব্যর্থ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে অনেকবার। ১৯৪৫ সালের ১ অক্টোবর ও-এস-এস তুলে দেওয়া হয়।

শেষ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কিন্তু শুরু হল শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই 'কোল্ড ওয়র'। আমেরিকা ও রাশিয়া আত্মপ্রকাশ করল বিশ্বের দুই প্রধান শক্তি রূপে। যুদ্ধ চলুক বা না চলুক দুই দেশই বুঝতে পারল স্পাইদের প্রয়োজনীয়তার কথা।

স্পাইংয়ের ইতিহাসে এমন কিছু গুপ্তচর ছিলেন যাঁরা একটা মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতেন। এঁদের মধ্যে আগে নাম করতে হয় রাশিয়ার গুপ্তচর সংস্থার ওলেগ পেনকভস্কির।

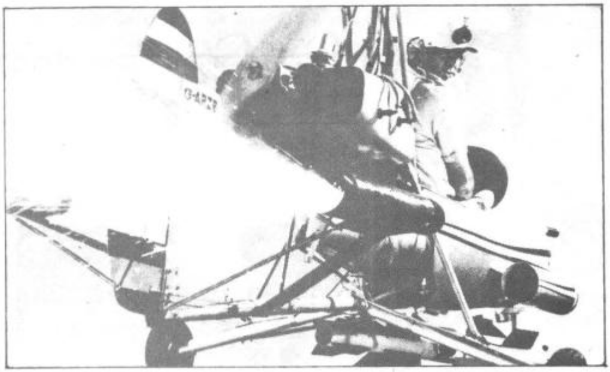

বিমান নিয়ে শত্রুর দেশে হানা

সেটা ১৯৬০ সাল। তৎকালীন সরকারের নানা সিদ্ধান্তে কাজের ব্যাপারে তাঁর মোহভঙ্গ ঘটতে থাকে। পেনকভস্কি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, সরকার বিশ্বকে পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, সরকারের কাজকর্ম কিছুতেই মেনে নিতে না পেরে তিনি দেশের গোপন খবর পশ্চিমে পাচার করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৬১ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬২ সালের অগস্ট পর্যন্ত তিনি পশ্চিমে পাঠিয়েছিলেন বিপুল পরিমাণ রাজনৈতিক ও সামরিক তথ্য। দারুণ উপকৃত হয়েছিল পশ্চিমি দুনিয়া। পেনকভস্কি কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে কাজ করছেন বলে অপরাধবোধে ভুগতেন না। স্বেচ্ছায় তিনি স্পাইংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। কেউ তাঁকে নিয়োগ করেনি, তাঁর কাজের জন্য আর্থিক লাভও তাঁর হয়নি। কোনও সহযোগীও ছিল না। যা করছেন সবই মানবজাতির ভালর জন্য, এই বিশ্বাস জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি আঁকড়ে ছিলেন। ধরা পড়ার পর ১৯৬৩ সালে মস্কোতে পেনকভস্কিকে গুলি করে মারা হয়। পেনকভস্কির মতো আমেরিকার নাথান হেলকেও সাধারণ গুপ্তচরদের পর্যায়ে ফেলা যায় না। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে জীবন বিপন্ন করে নাথান দেশের জন্য অমূল্য সব তথ্য জোগাড় করেছিলেন। ধরা পড়ার পর মাত্র বাইশ বছর বয়সে ফাঁসি হয় নাথানের। ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর আগে এই সাহসী মার্কিন যুবক বলেছিলেন, "আমার একটাই দুঃখ থেকে গেল। দেশের জন্য দেওয়ার মতো আমার কাছে মাত্র একটাই জীবন আছে।" নাথানদের মতো গুপ্তচরদের কাছে দেশসেবাটাই ছিল বড় কথা।

সিনেমায় গুপ্তচর

জনপ্রিয় গুপ্তচরদের নিয়ে টান-টান উত্তেজনায় ভরা অসংখ্য ছবি তৈরি হয়েছে। জেমস বন্ডের কাহিনী কিন্তু অনেকটাই সত্যি ঘটনাকে ভিত্তি করে লেখা। বিখ্যাত সোভিয়েত গুপ্তচর সংগঠন SMERSH-এর বিভিন্ন ঘটনাবলীই ইয়ান ফ্লেমিং তাঁর গল্পে বর্ণনা করেছেন। গুপ্তচর-দুনিয়ার কিংবদন্তি মাতাহারিকে নিয়ে ছবি হয়েছিল। ছবিটির নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন হলিউডের বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বো। ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে মাতাহারির মর্মান্তিক মৃত্যু দিয়ে শেষ হয়েছিল বিখ্যাত এই ছবিটি। জেমস বন্ডের চরিত্রে অভিনয় করে প্রভূত খ্যাতি কুড়িয়েছেন সন কোনারি, রজার মুর প্রমুখ। এখন আবার টিমোথি ডালটন বন্ড চরিত্রে অভিনয় করছেন। বিখ্যাত গুপ্তচর নার্স এডিথ ক্যাভেলকে নিয়েও ছবি হয়েছিল। একটিতে এডিথের চরিত্রে ছিলেন অ্যানা নিগল। অন্যটিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সিরিল থর্নডাইক। গুপ্তচরবৃত্তি নিয়ে তৈরি বিখ্যাত ছবিগুলির অন্যতম হল 'দ্য হাউস অন নাইনটি সেকেন্ড স্ট্রিট'। এফ-বি-আই-ও নাৎসি গুপ্তচরদের মুখোমুখি হওয়াই ছবিটির বিষয়। স্পাইদের নিয়ে হিচকক তৈরি করেছিলেন 'নটোরিয়াস'। রোমাঞ্চকর এই জগৎকে নিয়ে হালকা কমেডি জাতীয় ছবিও তৈরি হয়েছে একাধিক। এদের মধ্যে জ্যাক বেনি অভিনীত 'টু বি অর নট টু বি', বব হোপ অভিনীত 'দে গট মি কভারড', ও গ্রেগরি পেক অভিনীত 'অ্যাবারেস্ক' উল্লেখযোগ্য।

ও-এস-এস-এর এজেন্ট এরিক এরিকসনকে নিয়েও একটি বিখ্যাত ছবি তৈরি হয়েছে। ছবিটির নাম ছিল 'কাউন্টারফিট ট্রেইটর'।

ভয়ঙ্কর মানুষদের সঙ্গে লড়তে হয় গুপ্তচরদের

কিম ফিলবির রোমাঞ্চকর জীবন

কিম ফিলবির রোমাঞ্চকর গুপ্তচর-জীবনের কথা লিখেছেন **চঞ্চল পাল**

কিম ফিলবি বিশ শতকের একজন কুখ্যাত গুপ্তচর। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ইতিহাসের মোড় কতবার যে ঘুরে গেছে তাঁর হাতে, তা কে বলতে পারে ? তাঁর গোপন জীবনধারা ও কার্যপরিধির যেটুকু জানা গেছে, তাতেই তাঁকে সর্বযুগের সেরা বলা যায়।

কিম ফিলবির আসল নাম হ্যারল্ড অ্যাড্রিয়ান রাসেল ফিলবি। ছেলেবেলা থেকেই রোমাঞ্চের খোঁজে ঘুরে বেড়াতেন। গুপ্তচর-কাহিনী এবংগোয়েন্দা-গল্প পেলে এক নিশ্বাসে শেষ করে ফেলতেন। ক্রমশ রাডইয়ার্ড কিপলিং-এর লেখা গুপ্তচর কাহিনীর নায়ক 'কিম' তাঁরও স্বপ্নের নায়ক হয়ে উঠল। তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠল এঁর মতো গুপ্তচর হওয়া। তাই ভবিষ্যৎ জীবনে কিম নামটি নিয়ে তিনি তাঁর স্বপ্নের নায়কের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন।

কিম ফিলবির বাবা সেন্ট জন ফিলবি এই ভারতেই ব্রিটিশ সরকারের কাজকর্ম করতেন। এখান থেকে অবসর নিয়ে তিনি চলে যান আরবে। কিমও বাবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরতেন ওই রুক্ষ মরুদেশে। তারপর আর তাঁর পোষাল না। ফিরে এলেন ব্রিটেনে, ভর্তি হলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সময়টা তখন তিরিশের দশক। এইসময় সারা পৃথিবীতে অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তার পরিবেশ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও তার ঢেউ আছড়ে পড়ছে। কিম ক্রমশ হেলে পড়তে লাগলেন সমাজতান্ত্রিক শক্তির দিকে। এইসময় বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে ওঠে তিনজনের সঙ্গে—অ্যালেন বারজেস, ডোনাল্ড ম্যাক্‌লিন ও অ্যান্টনি ব্লান্ট। চারজনের মানসিকতাও এক, স্বপ্নও এক, লক্ষ্যও এক। কমিউনিস্ট স্টাডি সেন্টার নামে এক রাশিয়ান গ্রন্থাগারে তাঁরা নিয়মিত আড্ডা মারেন। এটা নামেই গ্রন্থাগার, আসলে এটা ছিল ছেলে-ধরার জাল। এই সংস্থার অধিকর্তা স্যামুয়েল কাহান ঘুরে বেড়ান, যদি কোনও বুদ্ধিদীপ্ত যুবককে টোপ দিয়ে গুপ্তচর করা যায়।

স্বাভাবিকভাবেই ওই চার বন্ধু কাহানের জালে পড়লেন, কারণ তাঁদের চোখে তখন গুপ্তচর হওয়ার রোমাঞ্চকর নেশা।

মস্কোয় কিম ফিলবি

কিম ফিলবির প্রথম অভিযান ভিয়েনায়। ওখানে তখন তুমুল গৃহযুদ্ধ চলছে। একদিকে কমিউনিস্ট,অন্যদিকে ফ্যাসিস্ট। দুঃসাহসী কিম একটামাত্র মোটরবাইক সম্বল করে ঢুকে পড়লেন ভিয়েনায়। শুধুমাত্র স্মৃতিশক্তির সাহায্যে মাথায় ভর্তি করে নিয়ে গিয়েছিলেন লড়াইয়ের ছক। আগে কোনওদিন ভিয়েনায় যাননি, কিন্তু সেখানে কোন গলিতে কীভাবে গেরিলাযুদ্ধ চালাতে হবে তার পরিকল্পনা তিনি পৌঁছে দিতে লাগলেন।

ওখানকার কাজ শেষ করে ফিলবি সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কাজ করতে লাগলেন লন্ডনের একটি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকায়। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি আশ্চর্য কেরামতি দেখাতে লাগলেন। তখন শুরু হয়েছে স্পেনে গৃহযুদ্ধ। তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্টদলের প্রতি সমর্থন। এটা কিন্তু তাঁর মনের কথা নয়, বরং বলা যায় দারুণ একটা চাল। কারণ সারা ব্রিটেনে কিম ফিলবি কমিউনিস্ট বিরোধী বলেপরিচিত হয়ে গেলেন। ব্রিটিশরা এই ধরনের লোকই চায়।

তাঁর সপ্রতিভ চেহারা, কমিউনিস্টদের প্রতি সোচ্চার বিষোদ্গার আর রাশিয়ান ভাষায় পারদর্শিতা দেখে ব্রিটেনের গুপ্তচর বিভাগ তাঁকে শিক্ষানবিশ হিসেবে নিয়োগ করল। এখানে ফিলবি গুপ্তচর হওয়ার সমস্ত পাঠ ও কায়দাকানুন কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ করলেন। শুধু তাই নয়, গুপ্তচরের কয়েকটি ছোটখাটো কাজে তিনি এমনই সফলতা অর্জন করলেন যে, তাঁকে একটি বিশেষ বিভাগের প্রধান করে দেওয়া হল। এই বিভাগের কাজ ছিল শত্রুপক্ষের সম্পত্তি ও অস্ত্রাগার গোপনে ধ্বংস করা।

এইবার অবসান হল তাঁর প্রতীক্ষার। শুরু হল ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা। এইসময় এমনই একটা খবর এল যে-খবর

ব্রিটেনের হাতে পড়লে রাশিয়ার বহু গুপ্তচরই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত এবং ব্রিটেনে তাদের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম বহুকাল পিছিয়ে যেত। খবরটা পাঠিয়েছিলেন তুরস্কে রাশিয়ার কনসাল-জেনারেল কনস্টিন ভল্কভ। ব্রিটেনে রাশিয়ার যত গুপ্তচর কাজ করছেন, তাঁদের বিস্তারিত বিবরণ তিনি জানাতে রাজি ছিলেন। পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন কমিউনিস্টদের হাত থেকে মুক্তি আর ব্রিটেনের রাজনৈতিক আশ্রয়। খবরটা পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ফিলবি তা নিজের কাছে চেপে রেখে কে জি বি-কে জানিয়ে দিলেন।

ভলকভ ঘণ্টায়-ঘণ্টায় খবর পাঠাতে লাগলেন তাঁকে ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ফিলবি 'যাচ্ছি, যাব' করে গড়িমসি করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ভল্কভ অপহৃত হলেন। তারপর থেকে ভল্কভকে আর কোনওদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এত কাণ্ডের পরেও ফিলবির ওপর কারও সন্দেহ হল না। এর পরই তিনি আর-একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেললেন সব সন্দেহ নিরসনের জন্য। তিনি তাঁর স্ত্রী লিজার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন কমিউনিস্ট বলে। আর খবরটা ফলাও করে প্রচারিত হল। সবচেয়ে মজার কথা, ব্রিটেন তাঁকে 'ওবিডিয়েন্ট অব ব্রিটিশ এম্পায়ার' উপাধিতে ভূষিত করল। কিন্তু একজন রয়ে গেলেন ব্যতিক্রম। তাঁর নাম জেম্‌স অ্যাঙ্গলেটন। এই ধুরন্ধর অফিসারের চোখে ফিলবির আচার-আচরণ খুব ভাল লাগত না। তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন বলছিল যে, কিম ফিলবি বিশ্বাসঘাতক। ১৯৪৬ সালে আলবেনিয়ায় ব্রিটিশ ও আমেরিকান গেরিলারা কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করবে বলে কথা ছিল। নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তার মধ্যে সবকিছু পাকাপাকি হওয়ার পরেও গেরিলারা আশ্চর্যভাবে বিধ্বস্ত হল। সম্পূর্ণ নির্জন বিশাল জঙ্গলে প্যারাসুটের সাহায্যে গেরিলাদের নামার কথা। কিন্তু নামার সঙ্গে-সঙ্গে তারা গুলিবিদ্ধ হল, কারণ কমিউনিস্ট সৈন্যরা আগেথেকেই ওখানে তৈরি হয়েছিল। কিছুদিন পরে গেরিলাদের সাহায্য করতে স্তেফান বান্দেরা নামে একজন গুপ্তচরকে পাঠানোর কথা ঠিক হল। মিউনিখ থেকে তিনি যখন আসার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, কে জি বি-র গুপ্তচররা তাঁকে খুন করল। এই ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে সর্বপ্রথম জেমসই সিদ্ধান্ত করলেন যে, এর জন্য প্রধানত দায়ী কিম ফিলবি।

কিন্তু ফিলবির চরও কম নেই। কথাটা তাঁর কানে ঠিকই পৌঁছে গেল। তিনি বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না। তাঁর কাজ করে চললেন। ইতিমধ্যে লন্ডনে দুই গুপ্তচর তাঁর বাল্যবন্ধু বার্জেস ও ম্যাকলিনকে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা তৈরি হল। ফিলবি সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের কাছে খবর পাঠিয়ে রাশিয়া পালিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি করে দিলেন। কিন্তু তিনি নিজে পালালেন না। অবধারিতভাবে তাঁকে ওয়াশিংটন থেকে লন্ডনে ডেকে পাঠানো হল জেরা করার জন্য।

ফিলবি গোবেচারার মতো মুখ করে হাজির হলেন। তিনি জানতেন যে, ব্রিটিশদের হাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নেই। আরও একটা অস্ত্র ছিল তাঁর হাতে তা হল কথায়-কথায় তোতলানো। সব সময়েই তিনি এইভাবে কথা বলতেন। তাই কোনটা তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত জবাব, তা ধরা যেত না। তাই ফিলবির বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা গেল না। তবু তাঁকে ওয়াশিংটনের কাজ থেকে সরিয়ে সাংবাদিক গুপ্তচর হিসেবে বেইরুটে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

সদাসতর্ক ফিলবি এবারই একটা ভুল করলেন। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁকে বাইরে পাঠিয়ে ব্রিটিশরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে। তিনি আঁচ করতে পারেননি যে, নিকোলাস এলিয়ট নামে একজন গুপ্তচরকে তাঁর পেছনে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। এলিয়ট কিছুদিনের মধ্যে ফিলবির বিরুদ্ধে বেশ কিছু তথ্য জোগাড় করে পাঠিয়ে দিলেন ব্রিটেনে। ১৯৬৩ সালে ফিলবি আর তাঁর তৃতীয় স্ত্রীকে একটি হোটেলের ভোজসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হল। আসল উদ্দেশ্য ছিল ফিলবিকে জালে ফেলা। ফিলবির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যখন এই চালটা আন্দাজ করতে পারল, তখন তাঁর গাড়ি সেই হোটেলের কাছাকাছি এসে পড়েছে। তিনি এক মুহূর্তে তাঁর পরিকল্পনা ছকে ফেললেন। হোটেলের বাইরে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে স্ত্রীকে বললেন, "বোসো, আমি সিগার কিনে নিয়ে আসছি।"

সেই যে ফিলবি উধাও হয়ে গেলেন, আর তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না। কিছুদিন পরে সারা বিশ্বের সংবাদপত্রে খবর বেরোল যে, ফিলবিকে মস্কোতে রাশিয়ার সর্বোচ্চ সরকারি সম্মান 'অর্ডার অব লেনিন' উপাধিতে ভূষিত করা হবে। ব্রিটিশ ও আমেরিকান গুপ্তচর মহল স্তম্ভিত হয়ে গেল। লন্ডন থেকে মস্কো তিনি কীভাবে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন, তা আজও রহস্যাবৃত। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিন একটা আত্মজীবনী লেখেন 'মাই সাইলেন্ট ওঅর'। অনেক সমালোচক বলেন, বইটিতে নাকি সত্যের চেয়ে কল্পনার রংটাই বেশি উজ্জ্বল। ব্রিটিশ ও আমেরিকানরা ফিলবিকে বলে 'জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতক' আর রাশিয়ানরা বলে 'সাচ্চা,আদর্শনিষ্ঠ'। নিন্দুকরা বলে 'হৃদয়হীন, পাষণ্ড',আর সমর্থকরা বলে 'প্রকৃত বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন'। তবু, সম্মানেই হোক আর অপবাদেই হোক, কিম ফিলবির গুপ্তচরবৃত্তি এবং তাঁর ক্ষুরধার মস্তিষ্কের কথা ইতিহাস কোনওদিনই ভুলবে না!

কিম ফিলবি

অ্যালেন বারজেস

ডোনাল্ড ম্যাকলিন

কেমব্রিজে থাকার সময় কিম ফিলবির সঙ্গে কয়েকজনের বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অ্যালেন বারজেস ও ডোনাল্ড ম্যাকলিন। এঁদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল এক চরচক্র। গুরুত্বপূর্ণ সব খবর সংগ্রহ করে গোপনে সেগুলি পাচার করাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ।

টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম ও গবেষণার উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ সালে টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর পত্তন হয়। পরবর্তীকালে শিক্ষার উঁচু মান এবং উৎকর্ষের কথা ভেবে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন এটিকে ডিমড ইউনিভার্সিটির মর্যাদা দিয়েছেন।

কোন বিষয়ে পড়ানো হয়

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শিক্ষাক্রমের মধ্যে আমরা বিশেষ দুটি পুরো সময়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাঠক্রম নিয়ে আলোচনা করব। এই পাঠক্রমের বিশেষত্ব হল দেশের অন্যত্র এ-বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স পড়ার সুযোগ রয়েছে অনেক ; সেই তুলনায় ডিগ্রি কোর্সের সুযোগ তেমন নেই ; অথচ কোর্সদুটির বেশ চাহিদা আছে। কোর্স দুটি হল : সোশ্যাল ওয়ার্কে এম· এ· কোর্স এবং পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনসে এম· এ· কোর্স। সোশ্যাল ওয়ার্কে চারটি বিষয়ের যে-কোনও একটিতে স্পেশালাইজেশন করা যায়। যেমন—(১) ক্রিমিনোলজি অ্যাণ্ড কারেকশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। (২) ফ্যামিলি অ্যাণ্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার। (৩) মেডিক্যাল অ্যাণ্ড সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্ক। (৪) আরবান অ্যাণ্ড রুরাল কমিউনিটি ডিভেলাপমেন্ট।

ভর্তির যোগ্যতা

সোশ্যাল ওয়ার্কে এম· এ· ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে হলে একজন প্রার্থীকে স্নাতক পর্যায়ে গড়ে সব বিষয়ে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। যদি কোনও প্রার্থী স্নাতক পর্যায়ে শতকরা ৪৫ নম্বর পেয়ে পাশ না করেন, কিন্তু কোনও বিষয়ে কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্সে পাশ করেন তা হলে তিনিও ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। কেউ যদি আইনের ডিগ্রিকে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনার জন্য বলেন, তখন বি· এ·, বি· এসসি· বা বি· কম· পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের হার আর হিসেবের মধ্যে ধরা হয় না, শুধুমাত্র ল' ডিগ্রি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হার হিসেব করা হয়। কোনও প্রার্থী যদি ১০+২+৩ পর্যায়ের স্নাতক না হয়ে দু' বছরের ডিগ্রি কোর্স পাশ করে থাকেন, সেক্ষেত্রে তাঁকে এক বছরের ব্রিজ কোর্স পাশ করে নিতে হয়। সেক্ষেত্রে স্নাতকস্তরে এবং ব্রিজ কোর্স পর্যায়ে একসঙ্গে কমপক্ষে শতকরা ৪৫ নম্বর পেয়ে পাশ করে থাকা চাই। পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনসে, এম· এ· ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে আর্টস, কমার্স কিংবা অন্য কোনও বিষয়ে ব্যাচেলার্স কিংবা মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ করে থাকতে হবে। যাঁরা ব্যাচেলার্স ডিগ্রি পাশ করবেন, তাঁদের ১০+২+৩ পর্যায়ের স্নাতক হতে হবে এবং কমপক্ষে এগ্রিগেটে শতকরা ৫০ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত এই নম্বরের হার কমপক্ষে ৫৫ শতাংশ। যদি কোনও প্রার্থী স্নাতকস্তরে (আর্টস, কমার্স গ্র্যাজুয়েটের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ এবং সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নির্দিষ্ট নম্বর না পান, অথচ মাস্টার্স ডিগ্রিস্তরে এই ন্যূনতম নম্বর পেয়ে পাশ করেন, তা হলে তিনি ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। পুরনো ডিগ্রি কোর্স যাঁরা পাশ করেছেন তাঁদের এক বছরের ব্রিজ কোর্স পড়ে নিতে হবে এবং দু'টি পরীক্ষার নম্বর একসঙ্গে হিসেব করে যদি ন্যূনতম নম্বর হয় তা হলে তিনিও আবেদন করতে পারবেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি বা

বোম্বাই শহরের দিওনারের টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর সুনাম এখন দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের নানা ধরনের উচ্চ মানের পেশাদারি শিক্ষা দিয়ে থাকেন, এই ইনস্টিটিউট তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল :

(১) শিক্ষার মান এবং উৎকর্ষের জন্য এটিকে ডিমড ইউনিভার্সিটির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

(২) এই প্রতিষ্ঠান সোশ্যাল ওয়ার্ক, পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনসে এম· এ· ডিগ্রি দিয়ে থাকেন।

(৩) অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম· এ· কোর্স পাশ করেও এখানে এম· এ· ডিগ্রি কোর্সে পড়া যেতে পারে।

(৪) তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুযোগ আছে।

(৫) এখান থেকে পাশ করার পর চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

(৬) সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ আছে।

বেসরকারি উদ্যোগের অফিসারদের যদি এইসব পাঠক্রম পড়ানোর জন্য পাঠানো হয় তা হলে ইউ জি সি-র অনুমতিক্রমে ভর্তির যোগ্যতা শিথিল করা যেতে পারে।

আবেদনের নিয়ম

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট ফর্মে ভর্তির আবেদন করতে হয়। ইনস্টিটিউটের নামে কুড়ি টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট (স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, দিওনার, বোম্বাই শাখার ওপর কাটা) পাঠালে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার(অ্যাকাডেমিক)টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস, দিওনার, বোম্বাই-৪০০ ০৮৮ ঠিকানার অফিস থেকে ফর্ম সংগ্রহ করা যায়। তবে অনুরোধপত্রে কোন কোর্সের জন্য ফর্ম চাওয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। সাধারণত ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এপ্রিল মাসের শেষ দিকে। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ পূরণ করা ফর্ম জমা দিতে হয়। লক্ষ রাখতে হবে দুটি কোর্সের ভর্তির জন্য ফর্ম কিন্তু আলাদা। প্রতিটি আবেদনপত্রের সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ পঁচিশ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট কিংবা পোস্টাল অর্ডার জমা দিতে হবে। তবে নির্দিষ্ট যোগ্যতার নম্বর না পেয়ে পাশ করে থাকলে আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

মনোনয়নের পদ্ধতি

জুন মাসে নির্দিষ্ট রুটিন অনুসারে প্রার্থীদের এসে রাইটিং টেস্ট, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই এই পরীক্ষাপর্ব শেষ হয়ে যায়। এসে টেস্ট বা রচনা পরীক্ষায় সাধারণত সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রচনা লিখতে দেওয়া হয়। নম্বর থাকে ৫০। প্রার্থী সমস্যার বিচার কোন আঙ্গিকে এবং কীভাবে তার উপস্থাপনা করেন সেটি এই রচনা পরীক্ষা থেকে যাচাই করা হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে তার ইংরেজি ভাষায় দখলের পরীক্ষাও করা হয়। এর পর গ্রুপ ডিসকাশন। এক-একটি দলে দশজন প্রার্থী রাখা হয়। প্রার্থী কীভাবে তাঁর চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করেন, দলের সঙ্গে কী সম্পর্ক বজায় রাখেন সবকিছুই যাচাই হয় এই আলোচনার মাধ্যমে। এটি ৩৫ নম্বরের পরীক্ষা। শেষ পর্যায়ে নেওয়া হয় ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউ পর্যায়ে যেতে হলে সোশ্যাল ওয়ার্কে ভর্তির প্রার্থীদের রচনা এবং আলোচনার পরীক্ষায় কমপক্ষে শতকরা ৩০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে এবং পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনসের প্রার্থীদের অবশ্যই পেতে হবে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নম্বর। উপরন্তু যে-বিষয়ে প্রার্থী স্পেশালাইজেশন করতে চান সে-বিষয়েও তাঁকে প্রশ্ন করা যেতে পারে। তফসিলি জাতি ও উপজাতির প্রার্থীদের জন্য দুটি পাঠক্রমেই আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। উপরন্তু তাঁদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বি· এ·, বি· এসসি· বা বি· কম· কিংবা মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ করলেই চলবে।

পড়াশোনার খরচ

এই প্রতিষ্ঠানটিতে পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুব বেশি নয়। এক বছরে টিউশন ফি ৬০০ টাকা, অন্যান্য ফি ৯০ টাকা, হস্টেল, ডাইনিং হল ও বিভিন্ন খরচ যথাক্রমে ৯০০ টাকা এবং ৩৫০০ টাকা, সোশ্যাল ওয়ার্কের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রথম বছরে রুরাল ক্যাম্প করার খরচ ২০০ টাকা, দ্বিতীয় বছরে স্টাডি ট্যুর ৫০০ টাকা, পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ছাত্রছাত্রীকে স্টাডি ট্যুর বাবদ দিতে হয় বছরে ৫০০ টাকা। এ ছাড়া ফিল্ড ওয়ার্ক বাবদ খরচ লাগে ১০০০ টাকা, দ্বিবার্ষিক শ্রেণীতে গবেষণার খরচ ২০০০ টাকা ইত্যাদি। মোটামুটিভাবে হিসেব করলে দেখা যায়, সোশ্যাল ওয়ার্কের ছাত্রপিছু প্রথম বছর লাগে ৭০৯০ টাকা এবং দ্বিতীয় বছর ৭১০০ টাকা। তেমনই পার্সোনেল ম্যানেজমেন্টের ছাত্রপিছু লাগে প্রথম বছর ৭৩৯০ টাকা এবং দ্বিতীয় বছরে লাগে ৭১০০ টাকা। হস্টেলে না থাকলে অবশ্য খরচ অনেক কম, ২০০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকার মধ্যে।

এই কোর্সের উপযোগিতা

সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট-এ এম· এ· ডিগ্রি নিয়ে কী লাভ এ-প্রশ্ন মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। যাঁরা সোশ্যাল ওয়ার্ক নিয়ে পড়াশোনা করবেন, তাঁদের যদি ক্রিমিনোলজি এবং কারেকশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্পেশালাইজেশন থাকে তা হলে সরকারি জেল, সমাজকল্যাণ, বিভিন্ন দফতরে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যাঁরা ফ্যামিলি এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার নিয়ে স্পেশালাইজেশন করবেন, তাঁরা উওমেন অ্যাণ্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, স্কুল সোশ্যাল ওয়ার্কার, ফ্যামিলি প্ল্যানিং সোশ্যাল ওয়ার্কার, বিভিন্ন পদে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেতে পারেন। তেমনই যাঁরা মেডিক্যাল এবং সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কে স্পেশালাইজেশন করবেন তাঁরা বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক, সেন্ট্রাল হেলথ ইনস্টিটিউট, কমিউনিটি হেলথ সেন্টার প্রভৃতি জায়গায় চাকরি পেতে পারেন। আরবান এবং রুরাল কমিউনিটি ডিভেলাপমেন্ট বিষয়ে স্পেশালাইজেশন করলে সরকারি, বেসরকারি সংস্থায় বিভিন্ন পদে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এবার পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনসের সুযোগ নিয়ে একটু বলা দরকার। বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থা, ফ্যাক্টরি, খনি, চা-বাগান, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁদের শ্রমিক নিয়ে কাজ-কারবার তাঁরা লেবার অফিসার, পার্সোনেল অফিসার, এমপ্লয়ি রিলেশনস অফিসার, লেবার অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস অফিসার প্রভৃতি পদে লোক নিয়ে থাকেন। এ সব পদে এই কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের নিয়োগের সম্ভাবনা প্রবল।

ছাত্রাবাসের সুযোগ

বোম্বাই শহরের বাইরে থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা ছাত্রাবাস আছে। ভর্তির আবেদনপত্রের সঙ্গে-সঙ্গেই ছাত্রাবাসের জন্যও আবেদন করতে হয়। খাওয়াদাওয়া বিষয়ে দেখাশোনার ভার থাকে ছাত্র প্রতিনিধি ও রেজিস্ট্রারকে নিয়ে গঠিত ডাইনিং হল কমিটির ওপর। নিরামিষ এবং আমিষ—দু' ধরনের খাবারের ব্যবস্থাই এখানে আছে। ভর্তির পরীক্ষার্থীদের সুবিধের জন্য হস্টেলে থাকা-খাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

ছবি : দেবাশিস দেব

একেই কি বলে কুয়াশা

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

"গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও," হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রুনু।

"কী হল ?" মেসো ভুরু কুঁচকে পেছনে তাকালেন। "পেটব্যথা করছে নাকি ?"

"না, না, ওই যে তোমার ডান দিকে তাকাও..." উত্তেজনায় গলা কাঁপছে রুনুর।

তার কথামতো সবাই ডান দিকে তাকাল। ঘোর কুয়াশা ততক্ষণে অনেকটা পাতলা হয়েছে। সকালবেলা দিল্লি থেকে গাড়ি নিয়ে ভরতপুর রওনা হওয়ার সময় সামনে তিন হাতও দেখা যাচ্ছিল না। মাসি খুব খুঁতখুঁত করছিলেন, "কী যে বাবা শখ তোমাদের, বুঝি না। এই ঘোর শীতে কেউ বেরোয় ? তার ওপর এই সৃষ্টিছাড়া কুয়াশা !"

সত্যি ! এরকম ঘন কুয়াশা শীতকালের ভোরবেলাই শুধু দেখা যায়, কিন্তু সে আটটা বাজতেই মিলিয়ে যায়। এইরকমই হয়ে আসছে চিরকাল। কিন্তু, এই বছর আবহাওয়া যেন সব আগেকার রেকর্ড ভেঙে দেবে বলেই ক্রমে তাপমান নামতে-নামতে দুই-তিনে গিয়ে ঠেকেছে। আর এই কুয়াশা। সারাদিনে রোদের সাক্ষাৎ নেই। মেঘের মধ্যে দিয়ে আসা-যাওয়া। এ কি দিল্লি না মুসৌরি পাহাড় ? অথচ এই সময়েই সবার ছুটি। একত্রিশে ডিসেম্বর, বছরের শেষ দিন রবিবার, তার আগের দিন শনিবার। মেসোর অফিস পর-পর তিনদিন ছুটি। রুনু-সুনুর স্কুল অবশ্য তেইশ তারিখ থেকেই বন্ধ। কলকাতা থেকে ওরা এসেছে মাসির বাড়ি দিল্লি। নতুন গাড়ি কেনার পর থেকে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়নি,– মেসোর ছুটি নেই বলে। তাই এই সুবর্ণ সযোগ হাতছাড়া করা যায় না। এটাই মেসোর অভিমত।

দলবল জুটে গেল। মাসতুতো দিদিরা বিয়ে হয়ে যে-যার শ্বশুরবাড়ি, কেউ দিল্লিতে থাকেন না। তবে এক পিসতুতো মামা আছেন। তাঁর দুই ছেলে, ছোটকু আর বুড়ো সানন্দে এই অভিযানে ভিড়ে গেল। ঠিক হল রাজস্থানের দিকে সফর করা হবে, পথে পড়বে ভরতপুর— পাখিদের স্বর্গরাজ্য। আগে থাকতে কিচ্ছু প্ল্যান করা হবে না। যখন যেখানে ইচ্ছে থামা, যে রেস্ট হাউসে জায়গা পাওয়া যাবে, সেখানেই রাত কাটানো। ছোটকুর মতে তাতেই নাকি আসল অ্যাডভেঞ্চার।

আপাতত পথে ঘন কুয়াশা ছাড়া আর কোনও অ্যাডভেঞ্চারের নামগন্ধও পাওয়া যায়নি। কে রাস্তায় বেরোবে এই কুয়াশা মাথায় করে ? হেডলাইট জ্বালিয়ে ঘণ্টায় দশ মাইল স্পিডে চলেছে গাড়ি। সত্যি বলতে কি, রুনু-সুনু দু'জনেই একটু হতাশ হয়ে পড়ছিল। কিন্তু ছোটকু মাঝে-মাঝেই বলছিল ওর লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ এবার কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

এখন রুনুর কথামতো সকলে ডান দিকে তাকিয়েই অবাক। ফিকে হয়ে আসা কুয়াশার মধ্যে দূরে দেখা যাচ্ছে খাড়া পাঁচিল আর তারও ওপারে আবছা ভাবে একটা মস্ত দুর্গের আউটলাইন।

"আরে, আরে। সত্যিই তো।" মেসো গাড়িটা রাস্তার একপাশে সরিয়ে আনলেন। হুড়মুড় করে নেমে এল সবাই। এতক্ষণ গাড়ির কাচের মধ্যে দিয়ে যা আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছিল, সেটা এবার ছবির মতো পরিষ্কার। সত্যি ওটা একটা দুর্গই বটে। ঠিক মনে হচ্ছে আকাশের গায়ে কেউ তুলি দিয়ে এঁকে রেখেছে। বিশাল জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে দুর্গ না বলে দুর্গের ধ্বংসস্তূপ বলাই ভাল।

বুড়ো বলল, "মেসো, ওখানটায় গাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে নাকি ?"

মেসো গম্ভীর হয়ে দূরত্বটা মাপার চেষ্টা করছিলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "উঁহু, এখানে তো পথ বলে কোনও ব্যাপারই নেই। কেবল পাথর আর ঢিবি।"

মাসি গাড়ি থেকে না নেমেই দৃশ্যটা দেখছিলেন। এবার বললেন, "যেখানে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না, তার মধ্যে আমি নেই। তোমাদের ইচ্ছে হয় হেঁটে ঘুরে এসো। আমি বরং এই ফাঁকে সোয়েটারটা শেষ করি।"

সুনু বললে, "মাসি, তুমিও চলো। থাক না সোয়েটার।"

মাসি আঁতকে উঠে বললেন, "তুই খেপেছিস নাকি ? আমি যাব হটহট্ট করে ওই

ভুতুড়ে জায়গায় ? না বাবা । আমাকে কেটে ফেললেও আমি পারব না । তোমাদের ইচ্ছে হয়, যাও ।"

রুনু বললে, "মাসি, এইজন্যই তোমাকে এত ভাল লাগে । মা থাকলে নিজে তো যেতই না, আর আমাদেরও যেতে দিত না ।"

বুড়োর কানে মাসির কথার খানিকটা গিয়েছিল বোধ হয় । সে ছুটে এসে বললে, "মাসি, তুমি কী করে জানলে ওটা ভুতুড়ে দুর্গ ?"

মাসি বললেন, "অতশত জানি না । দেখে তো মনে হচ্ছে তিন-চারশো বছর ওখানে মানুষ বাস করেনি । তার মানেই ভূতেদের আস্তানা ।"

মেসো ততক্ষণে মন স্থির করে ফেলেছেন । নতুন গাড়ি নিয়ে অবশ্যই ওই মাঠঘাটে যাওয়া যাবে না । তার চেয়ে হেঁটেই খানিকটা অ্যাডভেঞ্চার করে আসা যাক ।"

ছোটকু বলল, "আমি জানতাম ।"

বুড়ো বলল, "কী জানতিস ?"

"এই যে একটা কিছু ঘটতে চলেছে ।"

সুনু বেচারি ছেলেমানুষ, তাই কেউ তাকে পাত্তা দিতে চায় না । এবারে সে ভরসা করে জিজ্ঞেস করল, "ছোটকুদা, ওখানে ভূত আছে নাকি ?"

মেসো এক ধমক দিয়ে বললেন, "এই ছোটকু, কেন খামোখা ভয় দেখাচ্ছিস? না রে সুনু, তুই ওর কথা শুনিস না তো । ভূত আবার কী । ওসব কিছু নেই । স্রেফ ধাপ্পা ।"

সুনু মেসোর একটা হাত শক্ত করে ধরে বলল, "মেসো, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকব ।"

"দুর পাগলি । ভয় পাচ্ছিস কেন খামোখা, ঠিক আছে, ধরে থাক আমার হাত । কাছছাড়া হোস না ।"

বলতে-বলতেই ঝুপ করে নেমে এল মেঘের মতো কুয়াশা । রাস্তা, পাশের গাছপালা, এমনকী গাড়িটাও ধোঁয়ার মধ্যে ডুবে গেল । সেইসঙ্গে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডায় যেন হাড় অবধি জমিয়ে দিল ।

ছোটকু গলা চড়িয়ে বলল, "বুঝলি তো রুনু-সুনু, কাকে বলে শৈত্যপ্রবাহ । তোদের কলকাতায় এরকম শীত পড়ে ? আর এরকম কুয়াশা ?"

কলকাতা তুলে কথা বললে রুনুর রক্ত গরম হয়ে যায় । সে ওই আধো অন্ধকারের মধ্যেই বলে উঠল, "ইস, এসো না একবার কলকাতায় । শীতকালে কীরকম কুয়াশা হয় দেখিয়ে দেব ।"

"ও তো ধোঁয়াশা । কুয়াশা আর ধোঁয়াশার তফাত জানিস না ?"

এবারে রুনু একটু ঘাবড়ে গেল । সত্যিই সে কুয়াশা আর ধোঁয়াশা যে আলাদা, তা জানত না । মানে এতদিন জানত না । এরকম প্রাণঘাতী কুয়াশা সে তার ষোলো বছরের জীবনে এই প্রথম দেখল । কিন্তু তর্কে দমবার পাত্রী নয় সে । তাই গলা চড়িয়ে বলল, "জানি, জানি । বেশিক্ষণ থাকলেই কুয়াশা । আর বেলা হলে যেটা উবে যায়, সেটা ধোঁয়াশা ।"

সুনু ছাড়া সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল । কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, কেবল গলা শোনা যাচ্ছে । সম্ভবত সেইজন্যই সকলে বেশ জোরে-জোরে টেনে-টেনে হাসতে লাগল । আসলে ভয় পেয়েছে সকলেই, কিন্তু স্বীকার করতে চায় না কেউ । যাই হোক, মাসি সব সমস্যার সমাধান করে গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন, "কী হচ্ছে ওখানে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ? সব অসুখে পড়বে নাকি ? উঠে এসো বলছি গাড়িতে ।"

ম্যাজিকের মতো কাজ হল এই কথায় । সবাই হাতড়ে-হাতড়ে গাড়ির দিকে এগোল । গাড়ির দরজা খুঁজে পেতে বেশিক্ষণ লাগল না । কিন্তু কী ঠাণ্ডা, উহ্ । হাত যেন জমে যায় ।

ছোটকু বাহাদুরি করে হাতে দস্তানা পরেনি । সে-ই সবচেয়ে জোরে "উহ্" বলে উঠল ।

গাড়ির মধ্যে আলো জ্বালিয়ে খানিকটা ধাতস্থ হল সবাই । মেসো দরজা বন্ধ করে বললেন, "কই, কফির ফ্লাস্কটা কোনদিকে গেল ?"

মাসির সবরকম ব্যবস্থাই তৈরি থাকে । প্লাসটিকের কাপে একপ্রস্থ কফি খাওয়ার পর

রুনুই প্রথম মুখ খুলল।

"কুয়াশা কাটলে আমরা কিন্তু দুর্গে যাচ্ছি।"

বুড়ো বলল, "যাও না, কে বারণ করেছে। তবে মনে রেখো, ওখানে ভূত আছে।"

ছোটকু বলল, "হ্যাঁ, তিনশো বছরের পুরনো ভূত। এই দ্যাখো, আমার গায়ের লোম কীরকম খাড়া হয়ে গেছে।"

রুনু বললে, "ভূতের আবার নতুন-পুরনো কী? সব ভূতই পুরনো।"

মেসো বললেন, "আঃ, হচ্ছে কী?"

সুনু ততক্ষণে মাসির কাছে ঘেঁষে মাসির শালের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করছে।

মাসি বললেন, "তোমরা কথা থামাও। ওই দ্যাখো, আবার রোদ উঠেছে।"

সবাই চমকে উঠে বাইরে তাকাল। এ তো ভারী মজা! এই কুয়াশা, এই রোদ— এ যেন লুকোচুরি খেলা চলছে। রাস্তার ধারের গাছগুলো হঠাৎ যেন শূন্য থেকে গজিয়ে উঠল। লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল সবাই। কিন্তু গাড়ির ভেতরের গরম ছেড়ে ঠিক তখনই উঠবার জন্য তেমন গা করল না কেউ।

মেসো বললেন, "দাঁড়াও। নামবার আগে আমরা মোডাস অপরেন্ডিটা ঠিক করে নিই।"

সুনু মাসির শালের তলা থেকে মাথা বের করে বলল, "মোডাস অপরেন্ডি কী?"

ছোটকু বলল, "বিলিতি ভূত।"

মেসো বললেন, "আবার?"

ধমক খেয়ে চুপ করে গেল ছোটকু।

বুড়ো বলল, "এক কাজ করা যাক। যারা ভূতের ভয় পায় তারা গাড়িতে থাক। যেমন সুনু।"

মাসি বললেন, "ভূতের ভয় আমি পাই না, কিন্তু আমি বাবা গাড়ি ছেড়ে নড়ছি না। আগেই ঠিক করেছি নামব না। তারপর আবার এই বিদঘুটে কুয়াশা। তোমরা যদি যাবেই, তা হলে সঙ্গে একটা টর্চ নিও বরং।"

মেসো বললেন, "গুড আইডিয়া। বরং একটার বেশি টর্চ নেওয়াই বুদ্ধির কাজ হবে। ক'টা আছে আমাদের সঙ্গে?"

মাসি বললেন, "আমি তো একটাই তুলেছি। আর যদি কেউ এনে থাকে।"

ছোটকু বলল, "আমরা তো কেউ বাড়তি টর্চ আনিনি।"

মেসো বললেন, "বেশ। তা হলে একটাই নেওয়া হোক। এ ছাড়া আমার লাইটার আছে।"

বুড়ো বলল, "দড়ি নেবে না?"

রুনু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, "দড়ি? দড়ি কী হবে?"

বুড়ো অম্লান বদনে বলল, "কেন, কখনও পর্বতারোহণ করিসনি? জানিস না সবার কোমরে দড়ি বাঁধা থাকে?"

রুনু জিজ্ঞেস করল, "মেসো, আমরা কি পর্বতারোহণে যচ্ছি নাকি?"

মেসো বললেন, "এটা কিন্তু মন্দ আইডিয়া নয়। তা হলে যতই কুয়াশা হোক, কেউ হারিয়ে যাবে না।"

মাসি উল বোনার কাঁটা বের করে বেশ গুছিয়ে বসেছেন। এবার মুখ তুলে বললেন, "আমি একটা কথা বলব? এই ছিষ্টিছাড়া আবহাওয়ায় নাই-বা গেলে ওখানে?"

সমস্বরে প্রতিবাদ জানাল সবাই, "তবে সুনু ছাড়া।"

সত্যি বলতে কি, তার মাসির গায়ের গরম আর শালের গরম ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছেই করছিল না।

বাইরে চমৎকার রোদ দেখে বুড়ো আর ছোটকুর গান গাইতে ইচ্ছে হল। তারা বেসুরো গলায় শুরু করল—

"মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি, "

আকাশের চেহারা কিন্তু দেখতে-দেখতে বদলে গেল। রোদ উধাও—কেমন যেন মনখারাপ-করা আলো। বেশ লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগোতে লাগল সবাই। সবচেয়ে আগে বুড়ো, তারপর ছোটকু আর রুনু, আর সবশেষে মেসো। আবছা মতো কুয়াশা আবার জেঁকে বসল। হাতে টর্চটি বাগিয়ে ধরে সাবধানে পা ফেলতে লাগলেন মেসো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাকি তিনজনের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বেশ বেড়ে গেল। কুয়াশা ভেদ করে সামনে দেখা যাচ্ছে এক প্রাগৈতিহাসিক কেল্লা। কী আছে তার রহস্যময় প্রাকারের আড়ালে, কে জানে? যেন চুম্বকের মতো টানছে সবাইকে। ক্রমশ ছোটকু, বুড়ো আর রুনু তাদের হাঁটার স্পিড বাড়াতে-বাড়াতে প্রায় ছুটেই চলল ওই দুর্গ অভিমুখে। মনে হচ্ছে এখনও প্রায় এক কিলোমিটার, তবে ওরা যে স্পিডে যাচ্ছে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়।

মেসো মনে-মনে এইসব কথা ভাবছেন, হঠাৎ তাঁর পুরনো হাঁটুর ব্যথাটা কটাত করে জানান দিল। না, এই ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তাঁর কর্ম নয়। মেসো রণে ভঙ্গ দিয়ে হাঁক পেড়ে বললেন, "ওরে, তোরা বেশি দেরি করিস না যেন। আমি ফিরে চললাম।" ওরা পেছন ফিরে তাকাতেই উনি হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, ওঁর হাঁটু জবাব দিয়েছে।

ছোটকুও হাত নেড়ে উত্তর দিল, "ঠিক আছে। তুমি যাও। আমরা একঘণ্টার মধ্যেই ফিরছি।"

মেসো অ্যাবাউট টার্ন হয়ে চলতে লাগলেন রাস্তার দিকে। মনে-মনে একটু যে আফসোস হচ্ছিল না তা নয়। কিন্তু হাঁটুর ব্যথা খামোখা বাড়িয়ে লাভ কী। সেবারে অনেক ভুগিয়েছিল। শেষ অবধি হোমিওপ্যাথি করে তবে সারল।

কী মনে করে একবার পেছন ফিরে তাকালেন মেসো। আরে! দুর্গটা তো বেশ কাছে এসে গেছে মনে হচ্ছে। অথচ উনি তো হাঁটছেন উলটো দিকে। এটা কী করে সম্ভব?

চশমা খুলে কাচটা ভাল করে মুছে দু' চোখ রগড়ে আবার ভাল করে দেখলেন। একটু জল জমেছিল কাচে। না। এবারে কোনও ভুল নেই। দুর্গের প্রাকারের ওপর পাগড়ি পরা প্রহরীদের হাঁটাচলা, এমনকী তাদের পায়ের শব্দ তাঁর কানে এসে বাজতে লাগল—মচ-মচ, দুম-দুম। ক্রমশ অনেক মানুষের গলার আওয়াজ— মেসো একেবারে পাথর। তাঁর নড়াচড়ার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। খানিকক্ষণ এইভাবে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর মেসো দেখলেন প্রহরীদের আকার 'যেন একটু-একটু করে বড় হচ্ছে। এ আবার কী? নীচের দিকে নজর

করতেই তাঁর গায়ের লোম একেবারে খাড়া। তাঁর আর দুর্গটার মধ্যে যতটা খালি জমি ছিল সেটা যেন কমে আসছে— তা হলে কী··· তা হলে কী···

আর ভাববার সময় নেই। কোনও সন্দেহ নেই, দুর্গ এগোচ্ছে, খুব ধীরে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। এই তো তিনি স্পষ্ট দেখলেন, একজন উষ্ণীষধারী মানুষ হাততালি দিয়ে কাকে ডাকল।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলেন মেসো। পায়ের ব্যথার কথা তখন আর তাঁর মনেই নেই। একটুখানি ছুটে কিন্তু মনে হল এ কী ছেলেমানুষি, দুর্গ কখনও মানুষের পিছু ধাওয়া করতে পারে? ভূ-ভারতে এরকম কথা কেউ কখনও শুনেছে? আবার থামলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন সমস্ত আকাশ জুড়ে বিকট চেহারার সেই কেল্লা অন্তত আরও আধ কিলোমিটার এগিয়ে এসেছে এরই মধ্যে।

"ছোটকু, বুড়ো, রুনু। কোথায় গেলি তোরা? পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়।" গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করলেন মেসো। অনেকটা দূরে হলেও সেই আওয়াজ ছোটকুদের কানে গেল। মেসোর কিছু বিপদ-টিপদ হল নাকি? বাক্যব্যয় না করে তারাও ছুটতে শুরু করল রাস্তার দিকে।

ছুটতে-ছুটতেই রুনু বলল, "ছোটকুদা, দেখেছ দুর্গটা আমাদের তাড়া করে আসছে!"

ছোটকু, বুড়ো দু'জনেই প্রাণপণে ছুটছে তখন। তারই মধ্যে ঘাড় ঘুরিয়ে তারা ছোটার স্পিড আরও বাড়াল।

বুড়ো বলল, "ছোটকু, কী বুঝছিস?"

ছোটকু বলল, "এখন আর বোঝার কিছু নেই। যে করে হোক গাড়ির কাছে পৌঁছতে হবে।"

গাড়ির কাচ নামিয়ে মাসি তখন গল্প জুড়েছেন সুনুর সঙ্গে। সেই একবার তাঁরা চিতোরগড় গিয়েছিলেন। রানি পদ্মিনীর চিতোর— সেইসব গল্প। হঠাৎ সুনু সোজা হয়ে বসে বলল, "মাসি, শুনতে পাচ্ছ?"

মাসিও কান খাড়া করলেন, "আরে সত্যিই তো। আমাদের বীরপুরুষেরা সব ফিরে আসছেন যে!"

সুনু গম্ভীর মুখে বলল, "মাসি, তুমি বরং বোনাটা রেখে গাড়িতে স্টার্ট দাও। ওদের কোনও দুষ্টুলোক তাড়া করেছে মনে হচ্ছে। ডাকাত-টাকাত নয় তো?"

মাসির সবরকম ট্রেনিং-ই নেওয়া আছে। গাড়ি চালানো তার মধ্যে একটা। চোখের পলক পড়ার আগেই তিনি বোনা ফেলে স্টিয়ারিং ধরে বসেছেন। সুইচ অন করলেন। এঞ্জিন চালু হল। এবারে ওরা আরও কাছে এসে গেছে। গাড়িতে এসে ঢুকতে-না-ঢুকতেই গাড়ি নিয়ে পালাবার জন্য মাসি একদম রেডি।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে মাসি গাড়ির স্পিড কমালেন। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা চালাঘর। ধোঁয়া উঠছে। নিশ্চয় চায়ের দোকান। এবারে একটু থামা যাক। এতক্ষণে মেসোর গলা স্বাভাবিক শোনাল।

চায়ের দোকানের কম্বল মুড়ি দেওয়া আধবুড়ো লোকটি বেশ গল্পবাজ। সে বলল, "বাবুরা বোধ হয় ভুতুড়ে কেল্লার কাছে গিয়েছিলেন?"

মেসো দারুণ অবাক হয়ে বললেন, "তুমি কী করে জানলে?"

লোকটা মুচকি হাসল, "আমি এখানকার এতদিনের বাসিন্দা— আমি সব জানি। আপনাদের তো মোটর গাড়ি আছে— শাঁ করে চলে আসতে পেরেছেন। আগেকার জমানাতে যখন গোরুর গাড়ি ছিল তখন কী হত ভাবুন। কত লোক তো পড়ে গিয়ে জখমও হয়েছে।"

ছোটকু, বুড়ো, রুনু, সুনু— সবাই চা খাওয়া থামিয়ে লোকটার কথা শুনছিল। লোকটা বলল, "কী জানেন বাবু, শীতকালে খুব কুয়াশা হলে তবেই ওই কেল্লা হাজির হয়। অন্য সময়ে যান, কোথাও কিছু নেই। সব ফরসা।"

ছোটকু বলল, "তুমি দেখেছ?"

লোকটা বলল, "শুধু আমি কেন, আমার বাবা দেখেছে। ঠাকুর্দা দেখেছে, তার বাবা দেখেছে। কিন্তু ওই কুয়াশার মধ্যে। শীতকালে। গরমকালে ওটা থাকে না।"

রুনু তত ভাল হিন্দি বলতে পারে না। সে বুড়োকে বলল, "ওটা থাকে না, না ওটা দেখা যায় না?"

বুড়ো বলল, "স্রেফ চোখের ভুল।"

মেসো সায় দিয়ে বললেন, "আমারও তাই ধারণা। এর নিশ্চয়ই একটা কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। ছোটকু, তুই কী বলিস?"

ছোটকু তখনও ভুরু কুঁচকে আছে। সে বলল, "মেসো, আমাদের আবার আসতে হবে। একবার গরমকালে।

মাসি বললেন, "চা খাওয়া হলে এবার ওঠা যাক। কী বল?"

যেতে-যেতে সবার মনেই এক প্রশ্ন। বুড়ো বলল, "গুড বাই ভুতুড়ে কেল্লা।"

সুনু এতক্ষণে সাহস করে মুখ খুলল। মাসির হাতটা শক্ত করে ধরে সে বলল, "যাঃ, ভূত আবার আছে নাকি?"

ছবি : দেবাশিস দেব

নতুন ট্রাক্টর

ইলিয়নয়িস বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-বিজ্ঞানীরা এবার তৈরি করেছেন অভিনব এক আধুনিক ট্রাক্টর।
এই নতুন ট্রাক্টর চালানো হচ্ছে কম্পিউটারের সাহায্যে। ট্রাক্টরের ওপরে বসানো আছে একটি ভিডিও-ক্যামেরা, এই ক্যামেরার সঙ্গে চালক-কম্পিউটারের যোগাযোগ আছে। ক্যামেরায় ধরা পড়বে সামনের খেতটি, দেখা যাবে কোথায় আলপথ, গর্ত এ-সমস্ত আছে। ভিডিও ক্যামেরায় এ জাতীয় উঁচু-নিচু টিলা, আলপথ ধরা পড়লেই চালক-কম্পিউটারের নির্দেশে ট্রাক্টর সঙ্গে-সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। জায়গাটি কতখানি, কীভাবে খুঁড়তে হবে বা এড়িয়ে যেতে হবে!
এই ট্রাক্টরেও একজন কৃষক বসে থাকবেন, তবে ট্রাক্টর চালনায় তাঁর আর মনোযোগ না দিলেও চলবে। ট্রাক্টরে বসেই তিনি বীজ বপন ও জমি চষার পরিকল্পনা চালাবেন স্বচ্ছন্দে। ট্রাক্টর চালাতে তো তাঁকে আর বিন্দুমাত্র ভাবনা-চিন্তা করতে হচ্ছে না!

ছুরি-কাঁচিবিহীন অস্ত্রোপচার

শল্যচিকিৎসায় ছুরি-কাঁচির আর কোনও দরকার নেই!
পরীক্ষামূলকভাবে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে 'গামা-নাইফ'-এর ব্যবহার। বিশেষ প্রকৃতির এই 'নাইফ' বা ছুরির কল্যাণে মস্তিষ্কের জটিলতম অস্ত্রোপচারও এখন রীতিমত সহজ। যন্ত্রণাহীনভাবে সারিয়ে দেওয়া হচ্ছে ব্রেন-টিউমার ও অন্যান্য উপসর্গ। মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ত রক্তবাহকে ঠিক করে দেওয়ার কাজেও অতুলনীয় এই গামা-নাইফ।
গামা-নাইফ কিন্তু আদতে কোনও ছুরি নয়! রক্তপাত, কাটাকাটির কোনও ব্যাপারই এখানে নেই। কোবাল্ট-৬০ আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় বিকিরণকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে এই গামা-নাইফ।
যে-কোনও তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে তিনধরনের রশ্মি বিকিরিত হয়—আলফা, বিটা ও গামা। কম্পিউটারের সাহায্যে ২০১টি রশ্মিগুচ্ছকে বিশেষভাবে ফোকাস করে তৈরি হয় এই অভিনব 'সার্জিক্যাল নাইফ'। সুইডেন অনেকদিন আগেই এর ব্যবহার শুরু করেছিল, এখন আমেরিকার পিট্সবার্গ, ভার্জিনিয়া, আটলান্টা প্রদেশের চিকিৎসা-কেন্দ্রগুলিও এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী।
এই বিশেষ চিকিৎসায় মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারে গড়ে ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ ডলার খরচ পড়ে।

পেট্রোলিয়মের বদলে

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ এখন পেট্রোলিয়ম-সঙ্কট নিয়ে রীতিমত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কীভাবে পাওয়া যাবে মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন, হেলিকপ্টারের জ্বালানি?
ব্রাজিলের সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী আনা ক্লারা শেনবার্গ পৃথিবীকে নতুন এক আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন। পৃথিবীর ভাঁড়ারের সব পেট্রোলিয়ম ফুরিয়ে গেলেও দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। এই জ্বালানি-সমস্যার সমাধানে কাসাভা-ই যথেষ্ট!
ট্যাপিওকা জাতীয় সামান্য এক কন্দ-জাতীয় উদ্ভিদ কাসাভা!
শেনবার্গ জানিয়েছেন, আখের বদলে কাসাভা থেকে এবার ইথানল পাওয়া যাবে। আখ-চাষে অনেক যত্ন-আত্তি প্রয়োজন, সার এবং মাটি নির্বাচনেও সেখানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হয়।
কাসাভা নামক কন্দটির চাষ করতে এত বিশেষ যত্নের প্রয়োজন নেই, ব্রাজিলের প্রায় সর্বত্র এটি জন্মায়। কিন্তু প্রাথমিক অসুবিধে ছিল একটি জায়গায়। ইস্ট সহজে কাসাভার ওপর ক্রিয়া করে না!
অসুবিধের মুখোমুখি হয়েও দমলেন না আনা। ইঁদুরের অগ্ন্যাশয়-রসে নিঃসৃত যে বিশেষ এনজাইমটি স্টার্চের ওপর ক্রিয়া করে, জেনেটিক-এঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে সেই এনজাইমটিকে ইস্টে প্রবিষ্ট করা হল (প্রসঙ্গত বলা বাহুল্য, কাসাভা একজাতীয় স্টার্চ)। এর পর এটি থেকে বিশেষ একটি স্ট্রেইনের ব্যাকটিরিয়া পাওয়া গেল, যা স্টার্চকে ভাঙতে সক্ষম। এই ব্যাকটিরিয়া নিয়েই এখন গবেষণার চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ চালাচ্ছেন আনা।

সূক্ষ্ম অংশের বিশাল রঙিন ছবি ফুটে উঠবে ভিডিওতে-

মাইক্রোস্ক্যানার

ভাগ্যিস, চশমা-বিক্রেতা লিউয়েনহুক চশমার কাচ ও লেন্স নিয়ে সময় কাটাতে শুরু করেছিলেন!
ওইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে-করতেই লিউয়েনহুক হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন অসাধারণ এক বিবর্ধক যন্ত্র। নাম তার মাইক্রোস্কোপ!
কোষ-আবিষ্কর্তা রবার্ট হুক থেকে শুরু করে গলগি, সোয়ান প্রমুখ সব বিজ্ঞানী ওই যন্ত্রের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। শতাব্দীর পর শতাব্দী এগিয়েছে, উন্নত থেকে ক্রমশ উন্নততর হওয়ার দিকে এগিয়ে গেছে বিজ্ঞান-জগৎ। আর, ততই জটিল থেকে জটিলতর বিবর্তনের দিকে অগ্রসর হয়েছে ওই ছোট্ট যন্ত্র—মাইক্রোস্কোপ!
বিজ্ঞানীদের কাছে সে এখন আর শুধু নিছক যন্ত্র নয়, অন্যতম এক হাতিয়ার।
লিউয়েনহুকের আমলের সহজ, সরল সাধারণ 'সিম্পল মাইক্রোস্কোপ' আজ শুধুমাত্র ঐতিহাসিকের কৌতূহল। কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ পার হয়ে এতদিন চলছিল ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোস্কোপের যুগ।

নিউ জার্সির এডমন্ড সায়েন্টিফিক কম্পানি এবার ওই ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ-এর যুগও শেষ করে দিল। বাজারে তারা এবার নিয়ে এসেছে নতুন এক যন্ত্র 'মাইক্রোস্ক্যানার'। এতে একটি মাইক্রোস্কোপের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া আছে ভিডিও।
শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপটির চেহারা অনেকটা হ্যান্ড-মাইকের মতো। যে-জিনিস দেখতে চাই

সৌরঝড়ের রহস্য

গত বছর মার্চ মাসে এক নিঃশব্দ ঝড় বয়ে গেছে আমাদের গ্রহের ওপর দিয়ে। কানাডার কুইবেকে কাক-ভোরে বিকল হয়ে গেছে বিদ্যুতের লাইন। যেসব কানাডাবাসী বৈদ্যুতিক অ্যালার্ম ঘড়ি ব্যবহার করেন তাঁদের প্রত্যেকেরই দেরি হয়ে গেছে ঘুম ভাঙতে। আবার আমেরিকাতে অরিগঁ থেকে পেনসিলভ্যানিয়া পর্যন্ত বয়ে গেছে জোরালো বিদ্যুৎশক্তির ব্যাপক ঢেউ। ফলে অসংখ্য ট্রান্সফর্মার পুড়ে গেছে। উত্তরসাগরের ওপরে ভেসে বেড়াচ্ছিল 'ন্যাটো'-র একটি হেলিকপ্টার। হঠাৎই তার যাবতীয় যন্ত্র উলটো-পালটা রিডিং দিতে শুরু করল। তাজ্জব পাইলট বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে বলে উঠল : এসব কী ভুতুড়ে কাণ্ড হচ্ছে!

অথচ এই ঝড়ের সময় একটি গাছের পাতাও কাঁপেনি। বৃষ্টি পড়েনি একফোঁটা। আকাশে বিদ্যুৎঝলকের ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। আসলে, ন' কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরের সূর্য থেকেই জন্ম নিয়েছিল ওই ভূ-চুম্বকীয় ঝড়। সূক্ষ্ম যন্ত্রে ধরা পড়েছিল অসংখ্য সৌর-বিস্ফোরণ। সূর্যমুখী কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর যাবতীয় এক্স-রে

মাপক যন্ত্র পৌঁছে গিয়েছিল শেষ সীমায়। আর আমাদের গ্রহে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়েছিল ইলেকট্রন কণা আর পারমাণবিক কেন্দ্রীন। সৌর-বিস্ফোরণ যেন সূর্যে ফেটে যাওয়া কোনও প্রকাণ্ড টাইম বোমা। অতি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র সূর্যের 'করোনা' অংশে যে-শক্তি বন্দী করে রাখে সময়ে-সময়ে সেটাই বিস্ফোরণের মাধ্যমে মুক্তি পায়। তখনই ছড়িয়ে পড়ে তীব্র বিকিরণের ঝলক, আহিত কণার স্রোত আর অভিঘাত তরঙ্গ। ন্যাশনাল ওসানিক অ্যান্ড অ্যাটমসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মহাকাশবিজ্ঞানী জো হারম্যান বলেছেন, "কৃত্রিম উপগ্রহে যেসব যন্ত্রপাতি আমরা ব্যবহার করি তাতে ছোটখাটো সৌর-বিস্ফোরণ থেকে শুরু করে তার চেয়ে দশ হাজার গুণ তীব্র বিস্ফোরণও ধরা পড়ে। কিন্তু সাম্প্রতিক এই বিস্ফোরণে সব ক'টা যন্ত্রই তাদের ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ, এরকম তীব্র সৌর-বিস্ফোরণ আগে কখনও দেখা যায়নি।"

সৌর-বিস্ফোরণের তীব্রতা এগারো বছর পর-পর বেড়ে ওঠে। ১৯৯০ সালই হচ্ছে এই তীব্রতা চরমে পৌঁছনোর বছর। সেই কারণেই মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লেগেছেন এ-বিষয়ে বহুমুখী পর্যবেক্ষণের জন্য। প্রসঙ্গত, সৌরচক্র পর্যবেক্ষণের কাজ জ্যোতির্বিদেরা শুরু করেছিলেন ১৮৪০ সাল থেকে। জার্মান পর্যবেক্ষক হাইনরিশ শোয়াব বুধ গ্রহের কক্ষপথ খুঁটিয়ে দেখছিলেন নতুন একটি গ্রহ আবিষ্কারের আশায়। তখনই তিনি সৌরকলঙ্কের সন্ধান পান। একটানা তিরিশ বছর ধরে পর্যবেক্ষণের পর তিনি লক্ষ করেন, মোটামুটিভাবে বারো বছর পর-পর সৌরকলঙ্কের হ্রাস-বৃদ্ধি চরম মানে পৌঁছয়। এর পর থেকেই বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ ও সাধনা সৌরকলঙ্ক এবং সৌরঝড়ের রহস্য উন্মোচনের কাজ শুরু করেছে।

তার ওপরে মাইক্রোস্কোপটি ধরলেই হল। তার অতি সূক্ষ্ম অংশের বিশাল রঙিন ছবি ফুটে উঠবে ভিডিওর পরদায়। এই কাজের জন্য মাইক্রোস্কোপ ও ভিডিওর মাঝখানে রয়েছে শক্তিশালী ইলেকট্রনিক ইমেজ প্রসেসিং ইউনিট। ছবিতে কাপড়ের সুতোর রঙিন ছবি ফুটে উঠেছে ভিডিওর পরদায়। মাইক্রোস্ক্যানারের দাম আট হাজার ন'শো ডলার।

থিরার রহস্যের সন্ধানে

ছোট্ট দ্বীপ থিরার নানা রহস্যের কথা লিখেছেন **অরূপরতন ভট্টাচার্য**

গভীর সমুদ্রের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আগ্নেয়শিলার একটি দ্বীপ— রুক্ষ, কঠিন, কর্কশ শিলাস্তর চমৎকার এক অনুভূতি জাগায়। অচঞ্চল, স্থির পাথরের বুকে ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু ধ্যানগম্ভীর দ্বীপটি আত্মমগ্ন। অথচ এক সময়ে এই দ্বীপ জেগে উঠেছিল মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। সাগর তোলপাড়, দূর-দূরান্ত সচকিত। ভিসুভিয়াসের মতো এ কার ঘুম ভেঙে গেল আকাশে-বাতাসে আলোড়ন তুলে! এ তো শুধু আলোড়ন নয়, এ এক প্রলয়, বিপ্লব।

প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার কথা। সাগরের বুকে এই দ্বীপটি ছিল গোলাকার এবং আজ যেখানে শুধু জল, দ্বীপের শিলাস্তর ছড়িয়ে ছিল সেখানেও। কিন্তু এখন সেই দ্বীপের এ কী অবস্থা। চেহারায় যেন একফালি চাঁদ। দেখতে চমৎকার। প্রস্ত দিকটা আছে পশ্চিম দিকে মুখ করে।

ঈজিয়ান সাগরের বুকে এই দ্বীপটির নাম থিরা। সানতোরিনি নামেও এটি পরিচিত। স্পাইরিডন মারিনাটস নামে এক গ্রিক পুরাতত্ত্ববিদ ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে প্লেটোর আটলান্টিসের সন্ধান পান।

ঘুমন্ত দ্বীপটি যখন হুঙ্কার ছেড়ে জেগে ওঠে, তখন যে আলোর বিচ্ছুরণ হয়, তা মিশর দেশ থেকেও দেখতে পাওয়ার কথা। আর বিস্ফোরণের আওয়াজ স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে শোনা গেলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এ তো যে-সে বিস্ফোরণ নয়! দ্বীপটির বেশির ভাগই সাগর-গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

থিরার মাত্র সত্তর মাইল দক্ষিণে সাগরের বুকে আর-একটি দ্বীপ আছে। এটির নাম ক্রিট। পুরনো সভ্যতা সাগর-গর্ভে বিলীন আটলান্টিসের অনুসন্ধানে থিরার সঙ্গে ক্রিটের নামও একইসঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

ক্রিটে যখন চূড়ান্ত বিকাশ এবং উন্নতির কাল, থিরায় প্রলয় শুরু হয় সেইরকম এক সময়ে। এ এমন এক প্রলয়, বিশ্বের ইতিহাসে যার তুলনা মেলা ভার। আর ক্রিটের ওপরে তার ঢেউ এসে পড়বে না, মনে করা কঠিন

কিন্তু থিরায় বিস্ফোরণের জন্যই কি ক্রিট সভ্যতাটি বিলীন হয়ে গেল? নগর-সভ্যতা অগ্নিতে বিধ্বস্ত হল? একটির সঙ্গে কি অন্যটির সম্পর্ক আছে?

আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে একজন গ্রিক পুরাতত্ত্ববিদ বলেন, থিরার বিস্ফোরণ এবং ক্রিটের বিলুপ্তির মধ্যে সম্পর্ক আছে। পুরাতত্ত্ববিদের নাম স্পাইরিডন মারিনাটস।

তাঁর বক্তব্যের পেছনে একটি কারণও আছে। মিনোয়ানদের একটি বন্দরে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ চালানোর সময়ে তিনি থিরায় আগ্নেয়গিরি উদ্গীরিত একটি প্রস্তরখণ্ড পান বলে দাবি করেন। সেই প্রস্তরখণ্ড এবং অন্যান্য প্রাপ্ত জিনিস থেকে তিনি একটা রোমহর্ষক এবং চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছবার চেষ্টা করলেন। থিরার আগ্নেয়গিরির অনেক ছাই

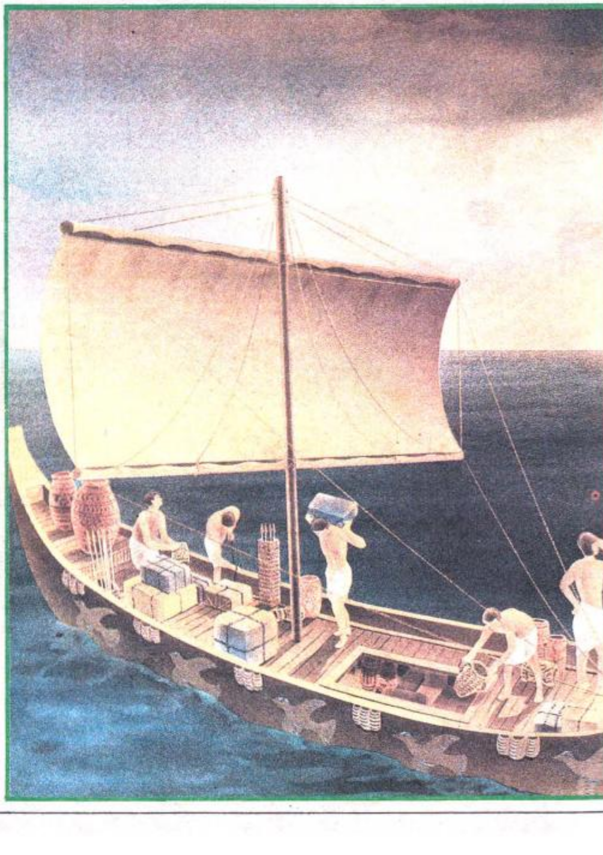

এসে জমা হয় ক্রিটের বুকে, বড়-বড় ঢেউ এসে বন্দরের বুকে আছড়ে পড়ে সে সময়ে— জাহাজ গুঁড়িয়ে যায়, বন্দর ভেঙে একাকার। আর ভূমিকম্পে বাড়ি-ঘর ভয়ানকভাবে নাড়া খায়— তেলের বাতি স্থির থাকে না, উলটে যায়। অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল সেই সময়ের এক বিশিষ্ট সভ্যতা।

কিন্তু পরবর্তী কয়েক দশকে বিভিন্ন পুরাতত্ত্ববিদ ব্যাপারটা সত্যের আদৌ কাছাকাছি কি না এ নিয়ে রীতিমত সংশয় প্রকাশ করেছেন। বরং তাঁরা উলটো কথা বলে মন্তব্য করলেন, মনে হয় সবটাই কল্পনানির্ভর।

এঁদের যুক্তি কিন্তু থিরা বা ক্রিটের শিলা বা ছাই অবলম্বনে গড়ে ওঠেনি। এঁরা বলছেন, এরকম একটা সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার পেছনে যে কারণই থাকুক, থিরায় অগ্নি উদ্গিরণ তার কারণ নয়। মিনোয়ান সভ্যতার ধ্বংসের শতাব্দীকাল আগেই থিরায় বিস্ফোরণ হয়ে থাকবে।

আসল কথা, মারিনাটস থিরায় বিস্ফোরণ সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা এবং অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সহজে তা মেনে নেওয়া কঠিন। মিনোয়ান ক্রিটের পতন প্রাচীন ইউরোপীয় ইতিহাসে একটা অধ্যায়ের মতো। একটা পর্বের সমাপ্তি, শুরু হচ্ছে আবার আর-একটি পর্ব। মিনোয়ানরা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরে ঈজিয়ান সাগরে এল মাইসেনিয়ানরা। ট্রয়ের কীর্তির সঙ্গে এঁদের নাম জড়িত। ঈজিয়ান সাগরে একটা ফাঁক তৈরি হয়েছিল মিনোয়ানদের অবলুপ্তির পরে। শক্তি এবং ক্ষমতার বরাবর একটা চাপ থাকে। সেটা অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল ক্রিটের সভ্যতার অবসানে। সেই ফাঁক এসে পূরণ করল মাইসেনিয়ানরা। বাতিল সভ্যতার পৃষ্ঠদেশে আবার নতুন করে এক সভ্যতা গড়ে উঠল। মূল ভূখণ্ড গ্রিস পূর্ব দিকে, বেশি দূরে নয়। সমস্ত আধিপত্যের ব্যাপারটা কেন্দ্রীভূত ছিল মূল ভূখণ্ড গ্রিসে।

মারিনাটসের প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পরেই তাঁর বক্তব্যের পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা শুরু হয়।

অবশ্য মারিনাটস নিজেও এ-কথা বুঝেছিলেন যে, বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। ষাটের দশকের মাঝামাঝি তিনি থিরায় অনুসন্ধান শুরু করেন। দেখা যাক, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন কিছু মেলে কি না। যদি তেমন কিছু পাওয়া যায়, তা হলে তা থেকে বিস্ফোরণের সাল-তারিখ পাওয়া কঠিন হবে না। অবশেষে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে থিরার দক্ষিণ প্রান্তে আক্রোটিরি গ্রামের কাছাকাছি 'অমূল্য রতন'-এর তিনি সন্ধান পেলেন।

এ এক বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। আগ্নেয়গিরির ছাই চাপা স্তূপের মধ্যে তিনি একটি দ্বিতল বাড়ি উদ্ধার করলেন একেবারে অক্ষত অবস্থায়। দেওয়ালের গায়ে অসাধারণ সব শিল্পকর্ম, যা থেকে এখানকার মানুষজনের জীবনযাত্রার একটা পরিচয় পাওয়াও সম্ভব হল। তিনি দেখলেন, এদের কাজকর্ম, খেলাধুলো, পুজো-পার্বণ সবের মধ্যেই ভোগ-বিলাসের চেহারা ফুটে ওঠে।

কিন্তু অনুসন্ধানে দুটো জিনিস মারিনাটসের নজরে এল না। কোনও কঙ্কাল তাঁর চোখে পড়েনি আর কোনও পুঁথিও তিনি খুঁজে পাননি। কঙ্কাল কেন নজরে আসেনি, সে-বিষয়ে অবশ্য একটা যুক্তি খাড়া করা যায়। আগ্নেয়গিরি জেগে উঠছে, আগে থেকেই এ-রকম একটা আভাস পেয়ে নগরবাসীরা দর-দূরান্তে পালিয়ে গিয়েছিল, অন্তত দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল।

পুঁথির অভাবটাও বিস্মিত করে তোলার মতো কোনও বিষয় নয়। ওই সময়ের কোনও লিখিত বিবরণ দুর্লভ। তা ছাড়া পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনেরও অভাব আছে। তবে থিরার দক্ষিণাঞ্চলে মারিনাটস প্রচুর মিনোয়ান মৃৎশিল্পের নমুনা সংগ্রহ করেন। থিরার সঙ্গে ক্রিটের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্ক

পর্যটকদের কাছে ঈজিয়ান সাগরের থিরার আকর্ষণ অনেক। পুরাতাত্ত্বিকদের কাছে এ যেন বিস্ময় ও রহস্যে ভরা আর-এক পম্পেই। বিজ্ঞানীরাও কম উৎসুক নন। সব মিলে, থিরাকে ঘিরে জমে উঠেছে অনেক প্রশ্ন।

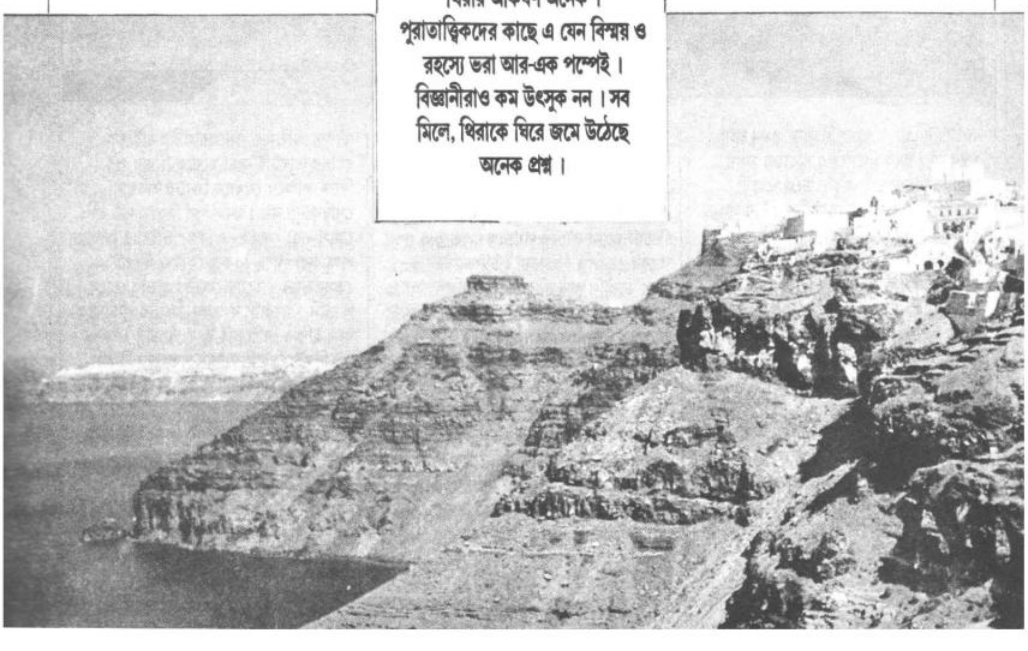

এবং এই সংগ্রহ করা মৃৎশিল্পের ভিত্তিতে ঈজিয়ান ইতিহাসের সময়কাল নির্ধারণের একটা চেষ্টা হল।
কিন্তু মৃৎশিল্প অবলম্বনে সময়কাল নির্ধারণ করা হবেই বা কীভাবে ? এই সময়কাল নির্ধারণের জন্য মিশরের দিকে তাকাতে হবে। মিশরের সঙ্গে ঈজিয়ান অঞ্চলের বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল বলে দুটি অঞ্চলের অনুরূপ শিল্পকর্ম ধরে সময় নির্ধারণের একটা চেষ্টা করা যায়। মিশরে অনেক পুঁথি আছে। সেইসব পুঁথি রত্নের আকর। পুরাতাত্ত্বিক অনেক পরিচয় আছে তার মধ্যে। সেই পুঁথি এবং পুরাতন নথি অবলম্বনে কোনও পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সময় জানা সম্ভব।
তা হলে ক্রিটের সময়ের ব্যবধান পঞ্চাশ বছর। উভয়ের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন থাকলেও থিরা নিশ্চয়ই ক্রিট থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার মৃৎপাত্র আমদানি করত না। তা হলে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে একটা কথা বলা যায়, থিরায় আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গিরণ এবং ক্রিটের অবলুপ্তির মধ্যে পঞ্চাশ বছরের একটা ফাঁক রয়ে যাচ্ছে।
মারিনাটস আর-একটা কথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর বক্তব্যকে ঠিকমতো তুলে ধরতে হলে শুধু পুরাতত্ত্বের মধ্যে আটকে থাকলে চলবে না। পুরাতত্ত্বের বাইরেও আর কী প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া যায়, দেখা দরকার। সেইজন্য তিনি চাইলেন,
সংগ্রহ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভিটালিয়ানো দম্পতি ছাইয়ের খোঁজ পেলেন বটে কিন্তু কোনও নমুনাই মারিনাটসের তত্ত্বকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার মতো নয়। মূল কথা, তাঁদের আবিষ্কার এবং সাল-তারিখ মারিনাটসের তত্ত্বকে সমর্থন করেনি। ডরোথি বললেন, "আমরা যা দেখতে পেলাম, তাতে খুব মন খারাপ হয়ে গেল। কারণ এটা এমন একটা চমৎকার তত্ত্ব।"
ক্রিটে ছাই পড়ার শুধু সময়টাই যে মিলল না তা নয়, ছাইয়ের পরিমাণও হিসেবমতো হল না। যে-ছাই পাওয়া গেল, তা যথেষ্ট ছিল না। ভূমধ্যসাগরের তলদেশের কিছু-কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন ভূতত্ত্ববিদেরা।

থিরার দক্ষিণাঞ্চল আক্রোটিরি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এইসব মৃৎপাত্র। এই মৃৎপাত্রগুলিই কি বলে দিতে পারে ঈজিয়ান ইতিহাসের সময়কাল ? মিশরের সঙ্গে ইজিয়ান অঞ্চলের বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল বলে দুটি অঞ্চলের একই ধরনের শিল্পকর্ম বিচার করে সময় নির্ধারণের চেষ্টা করা যায়।

ব্যাপারটা যে পুরো বিজ্ঞান, এমন বলা যাবে না। তবে মৃৎশিল্পের সাহায্যে সময় নির্ধারণ নিঃসন্দেহে একটা উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। কিন্তু মিনোয়ানরা ঠিক কোন সময়ে ধ্বংস হয়, তা হিসেব করার জন্য পুরাতত্ত্ববিদদের সেই সময়ের অনেক শিল্পকর্ম দরকার। অথচ তার অভাবটাই এখানে প্রকট হয়ে উঠেছে।
তবু যতটুকু সূত্র পাওয়া গেছে, তা কিন্তু মারিনাটসের পক্ষে যায় না। আজ পুরাতত্ত্ববিদেরা একমত যে, ক্রিটের বুকে মিনোয়ান সভ্যতা ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয় খ্রিস্টপূর্ব ১৪৫০ অব্দের সমসাময়িককালে। থিরার দক্ষিণ ভাগে মারিনাটস যেসব মৃৎশিল্প পেয়েছিলেন তার কোনওটিই খ্রিস্টপূর্ব দেড়হাজার অব্দের আগের সময়ের নয়। মৃৎশিল্প এবং মৃৎপাত্রের ভিত্তিতে থিরার সঙ্গে
ভূতাত্ত্বিকেরা এগিয়ে আসুন, অন্যান্য ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীরাও যেন পিছিয়ে না থাকেন।
সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে ভূতাত্ত্বিক এক দম্পতি চার্লস ভিটালিয়ানো এবং ডরোথি ভিটালিয়ানো তাঁদের পর্যবেক্ষণলব্ধ ফল পেশ করেন। চার্লস ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটিতে এবং ডরোথি আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মারিনাটস এঁদের মিনোয়ান অঞ্চলে থিরার ছাইয়ের অনুসন্ধান করতে বলেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ১৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের জমা প্রচুর ছাইয়ের খোঁজ মিলবে। কারণ, হিসেব করে দেখা গেছে আগ্নেয়গিরি থেকে আবহমণ্ডলে প্রায় পাঁচ ঘন মাইল ছাই উদ্গীর্ণ হয়েছে। ব্যাপারটা মোটেই উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। ফলে ভূতাত্ত্বিক দম্পতি উঠেপড়ে লাগলেন। বছরের পর বছর ধরে নমুনা
তাঁদের অভিমত, আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের বেশির ভাগটাই জমা হয়েছে থিরার পূর্ব দিকে, দক্ষিণে যেখানে ক্রিটের অবস্থান, সেদিকটায় নয়। ফলে পূর্ব দিকের দুটি দ্বীপ কোস এবং রোড্‌স-এ বিস্তর ছাইয়ের আস্তরণ লক্ষ করা গেছে। কিন্তু কোনও দ্বীপেই তেমনভাবে ছাইয়ের কোনও প্রভাব চোখে পড়েনি। ডরোথি বলছেন, ক্রিটের পূর্ব দিকে আধ ইঞ্চির বেশি ছাই জমা পড়েনি। অথচ এই দিকটাতেই মিনোয়ান সভ্যতার বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। কিন্তু আধ ইঞ্চি ছাইয়ের বর্ষণে একটা সভ্যতা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে, এমন আশঙ্কা নেই বলেই মনে হয়।
শুধু ছাই নিয়ে নয়, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধানের কাজ চলল। আরও গবেষক এগিয়ে এলেন। থিরায় আগ্নেয়গিরির অগ্নি

উদ্গিরণের সময়ে যে জলোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল, তার ঢেউ এসে কি পড়েছিল ক্রিটের বুকের ওপরে ? মারিনাটস সেরকম কথাই বলেছিলেন এবং এ-কথা ঠিক যে, আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গিরণ থেকে এ-ধরনের বিপর্যয় ঘটা খুবই সম্ভব । কিন্তু ক্রিটের তটদেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি ।

সাধারণভাবে তটদেশে পাললিক একটা স্তর জমা হয় এইরকম প্রাকৃতিক ঘটনার ফলে । থিরার দক্ষিণে ক্রিটের অবস্থান তা হলে ক্রিটের উত্তরভাগে, এ-রকমটা হওয়ারই কথা । তা ছাড়া সত্তর মাইল দূরের ঢেউ যদি ৬০০ ফুট উঁচুতেও ওঠে, তা হলে ক্রিটের উপকূলে তা ৩০ ফুটে নেমে আসার কথা । তাতে কি একটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ?

তবে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে মনে হয় ক্রিট ছাই চাপা পড়ে কিংবা জলোচ্ছ্বাসে ধ্বংস হয়নি, ক্রিট ধ্বংসের মূল কারণ অগ্নিকাণ্ড । মারিনাটস বলেছিলেন, থিরায় আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হল, তাতে তেলের বাতি উলটে যেতে পারে । আর তা থেকেই অগ্নিকাণ্ড ঘটে যাওয়া সম্ভব । কিন্তু যেসব আগ্নেয়গিরি বিশেষজ্ঞ থিরা অঞ্চলটি পর্যবেক্ষণ করেন, সত্তর মাইল দূরের একটি দ্বীপে আগ্নেয়গিরি-জাত কোনও ভূমিকম্প কতটা ক্ষতি করতে পারে, এ নিয়ে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেন ।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে থিরা দ্বীপে মারিনাটসের মৃত্যু হয় । তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই হাওয়া দিক বদল করতে শুরু করে । কিন্তু তাঁর সমর্থকও কেউ-কেউ রয়ে গেলেন । এই যে মতবিরোধ, এর মূল কারণ থিরায় আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের সময়কাল ঠিকমতো নির্ণয় করা যায়নি ।

এরকম একটা অবস্থায় প্রমাণের খোঁজে গবেষকেরা থিরা বা ক্রিট থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন অন্যদিকে ।

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় এক ধরনের পাইন গাছ আছে যা সাড়ে চার হাজার বছরেরও বেশি সময় বেঁচে থাকতে পারে । এরাই পৃথিবীর প্রাচীনতম জীবিতের নমুনা । গবেষকরা কয়েক হাজার বছর আগেকার জলবায়ুর অনুসন্ধান করবার সময়ে এদের কাজে লাগিয়েছেন ।

এইভাবে দেড়শো-দু'শো বছরের ইতিহাসে জলবায়ুর হেরফেরের বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণের সঙ্গে বিজ্ঞানীরা গুঁড়ির চক্রের প্রসারের সামঞ্জস্য দেখতে পেয়েছেন । এইরকম এক নজির হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় মারাত্মক তুষারপাতের কথা । আর আগের বছর ইন্দোনেশিয়ায় আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত । বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন, এ-সবই ছাপ ফেলে গেছে পাইন গাছের বার্ষিকচক্রের প্রসারের মধ্যে । জলবায়ুর ওপরে প্রভাব পড়েছে অতীতের এমন অনেক ঘটনার সাক্ষ্য ধরা রয়েছে পাইন গাছের গুঁড়ির বার্ষিকচক্রে ।

গাছের গুঁড়ির ভেতরের চক্রের ভিত্তিতে জলবায়ু নির্ধারণের চর্চা কালের ইতিহাসে সাল-তারিখ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । আজ এই পদ্ধতির সাহায্যে অনেকটা নিখুঁতভাবে সাল-তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে উঠছে ।

এইভাবে থিরায় অগ্ন্যুৎপাতের কাল বিজ্ঞানীরা কত অনুমান করলেন ? বার্ষিকচক্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে বিজ্ঞানীরা জানালেন, থিরায় অগ্ন্যুৎপাত ঘটে ১৬২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে । অর্থাৎ দেখা গেল, থিরায় অগ্ন্যুৎপাতের যে সাল-তারিখ এতদিন পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ধরে আসছিলেন, তা আসল সময় থেকে এক শতাব্দীর চেয়েও বেশি পরবর্তীকালের হবে । ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বেলফাস্টের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল বেইলি আয়ারল্যান্ডের জলা থেকে সংগ্রহ করা ওক গাছ অবলম্বনে একটা কালানুক্রমিক জলবায়ুর চিত্র তুলে ধরেন । তাতে দেখা গেছে, গাছের গুঁড়ির মধ্যে বার্ষিকচক্রের প্রসার অস্বাভাবিক ক্ষীণ । বিশেষজ্ঞদের মতে, এর কারণ ওই বছর তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের তুলনায় অত্যন্ত কম । ফলে আশানুরূপ এবং অভিপ্রেত বৃদ্ধি নজরে আসেনি ।

অগ্নি উদ্গিরণের এই সাল-তারিখ নানা দিক থেকেই সমর্থিত হয়েছে । কোনও আগ্নেয়গিরি যখন তেমনভাবে জেগে ওঠে, তখন যে সালফিউরিক গ্যাস জ্বালামুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, তা ঊর্ধ্বে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পর্যন্ত উঠে যেতে পারে । শেষপর্যন্ত সালফিউরিক অ্যাসিড হিসেবে পৃথিবীতে নেমে আসার আগে আমাদের গ্রহকে ঘিরে ছড়িয়ে যাবে ।

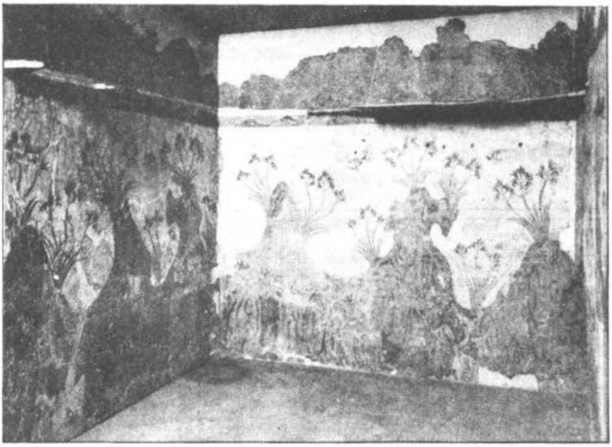

থিরার ফ্রেস্কো । দেওয়ালে আঁকা এই অতুলনীয় শিল্পকীর্তিটির নাম 'বসন্ত' । রঙে রেখায় ফুটে উঠেছে সুপ্রাচীন সভ্যতার সূক্ষ্ম কল্পনা । আগ্নেয়গিরির ধ্বংসলীলার হাত এড়িয়ে এগুলি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে । শুধু শিল্পকীর্তি হিসেবেই নয়, ইতিহাস হিসেবেও এর মূল্য অনেক ।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লস হ্যামার বুঝতে পেরেছিলেন, থিরার অগ্নি উদ্গিরণের ফলেও এমন হয়ে থাকবে এবং তা গ্রিনল্যান্ডে বরফের আস্তরণের মধ্যে জমা হয়ে থাকার কথা।

গাছের বার্ষিকচক্রের মতো প্রতি বছরই বরফের এক-একটা আস্তরণ জমা হয়। তা হলে এক-একটা স্তর থেকে এক-একটা বছরের হিসেব পাওয়া যাবে। এর মধ্যে যদি কোনও স্তরে অ্যাসিড পাওয়া যায়, তা হলে আশপাশের বিভিন্ন স্তরের চেয়ে সেই স্তরে তুলনায় দ্রুত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে, হ্যামারের যুক্তি ছিল এইরকম। ফলে বরফের স্তর ভেদ করে ড্রিলিংয়ের কাজ চলতে থাকে। শেষপর্যন্ত কয়েক বছর ড্রিলিংয়ের কাজ চালানোর পরে মাত্র বছর-তিনেক আগে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে এ-রকম একটি স্তর পাওয়া গেল। হ্যামারের গবেষক-দল সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, থিরায় অগ্নি উদ্গিরণের সময়কাল ১৬৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এগোলে তা ১৬২৫ পর্যন্ত আসতে পারে, পেছোলে ১৬৬৫ পর্যন্ত হওয়া সম্ভব।

অগ্ন্যুৎপাতের সাল-তারিখ নিয়ে অস্পষ্টতা ক্রমশ কেটে যেতে লাগল। পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হেনরি মাইকেল থিরার দক্ষিণাঞ্চলের আক্রোটিরি থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন সামগ্রীর সময়কাল নির্ধারণের চেষ্টা করছিলেন রেডিও কার্বন পদ্ধতির সাহায্যে। এইসব জিনিসের মধ্যে ছিল কাঠের টুকরো থেকে যবের দানা পর্যন্ত নানা ধরনের জিনিসপত্র। মাইকেল ১৬২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কোনও জিনিসই খুঁজে পাননি এ-সবের ভেতর থেকে।

প্রথমে অবশ্য তাঁর সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। তাঁরা সরাসরি মাইকেলের বক্তব্যকে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু নতুন কিছু নমুনা নিয়ে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মাইকেল যখন তাঁর বক্তব্য পেশ করে থিরার অগ্ন্যুৎপাতের কাল ১৬২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা তার কুড়ি বছর এ-দিক ও-দিক হতে পারে বলে দাবি করলেন, তখন আর কেউ মাইকেলের কথা অস্বীকার করতে পারলেন না। সব দিক দিয়ে থিরায় ভূমিকম্পের কাল একটা নির্দিষ্ট সময়ে এসে পৌছল।

মাইকেলের বক্তব্যে এবং সিদ্ধান্তে এবারে কিন্তু কোনও-কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসাহিত হলেন। মাইকেলের বক্তব্যকে অস্বীকার না করে তাকে আর-একটু যাচাই করে দেখার চেষ্টা চলতে লাগল।

মিশরের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে মিনোয়ান মৃৎশিল্পের সাল-তারিখের যে হিসেব পাওয়া গেছে, থিরায় অগ্ন্যুৎপাতের নতুন সময়ের সঙ্গে সেখানে কোনও গরমিল নজরে আসছে না তো?

থিরার দক্ষিণ ভাগে মারিনাটস যেসব মৃৎশিল্প পেয়েছিলেন, তার কোনওটিই দেড় হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগের সময়ের নয় বলে মনে করা হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আবার নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন, আরও একশো বছর অর্থাৎ ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পিছিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার ওদিকে কখনওই নয়। অর্থাৎ ওইসব মৃৎশিল্পই থিরায় অগ্ন্যুৎপাতকালের সর্বশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। তা হলে কালানুক্রমে প্রত্নতাত্ত্বিক দিক দিয়ে ব্যাপারটা মেনে নেওয়া যায়। এই বক্তব্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ বিটানকোর্ট।

বিনামূল্যে ফেম থেকে

প্রতি ৯০ গ্রা. প্যাক-এর সঙ্গে
২টি অপূর্ব ব্যাগ ক্লিপ বিনামূল্যে

তাড়াতাড়ি! স্টক থাকা পর্যন্তই এই সুযোগ পাবেন।

Dazzal-Ben

ধারাবাহিক উপন্যাস

কালাপাহাড়

সমরেশ মজুমদার

কাল জলপাইগুড়িতে ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে গিয়েছিল। জল্পেশ্বর মন্দির দেখে ত্রিদিববাবু গিয়েছিলেন জটিলেশ্বর মন্দির দেখতে। ফলে দেরি হয়ে গেল বেশ। জটিলেশ্বর জল্পেশ মন্দির থেকে মাত্র চার মাইল দূরে। অথচ এর কথা শহরে এসে তেমন শোনা যায় না। শহরে ফিরে আসার সময় ত্রিদিববাবু বললেন, "জল্পেশ মন্দিরের আকৃতি নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। দেখেছেন, মুসলিম সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে ওর নির্মাণে! অথচ মূল মন্দিরের কাছে বাসুদেব মূর্তি বা ক্ষয়ে যাওয়া গণেশ মূর্তি দেখলে বোঝা যায় পালবংশের সময়েই মন্দির তৈরি। তখন তো মুসলিম সংস্কৃতি এ-দেশে আসেনি।"

অর্জুন কানখাড়া রেখেছিল। কালাপাহাড় এই মন্দিরের ক্ষতি করার পর যখন সংস্কার করা হয়েছিল তখনই কি ওই পরিবর্তন এসেছিল? ত্রিদিববাবুকে সে-কথা বলতে তিনি বললেন, এ-ব্যাপারে তাঁর কিছু জানা নেই।

রাত হয়ে গিয়েছিল বলেই সে অমলদার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। বাড়ি ফিরে দেখল বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। রাস্তা থেকেই দেখল কেউ একজন বসে আছেন। এখন মাঝে-মাঝেই তার কাছে মানুষজন সমস্যা নিয়ে আসেন। মা তাঁদের বসতে বলেন তার ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকলে। দরজায় দাঁড়াতেই সে এক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেল। চল্লিশের কোঠায় বয়স, শরীর একটু ভারী হলেও সুন্দরী না বলে পারা যায় না। জামাকাপড়ে এবং ভঙ্গিতে বেশ পয়সাওয়ালা ঘরের মহিলা বলেই মনে হয়।

ভদ্রমহিলা বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি অর্জুনবাবু?"

"হ্যাঁ।" কাঠের টেবিলের উলটোদিকের চেয়ারটায় বসল সে।

"ও। আমি এক্সপেক্ট করিনি আপনি এত অল্পবয়সী।"

"বলুন, কেন এসেছেন?"

"আমি মিস্টার অমল সোমের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। প্রায় ঘণ্টাদেড়েক অপেক্ষা করছি।"

"আপনার সমস্যা কী?"

"হৈমন্তীপুর চা-বাগানটা আমাদের। আমার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ার পরে বাগানে খুব গোলমাল হয়েছিল। শ্রমিক বিক্ষোভ, মারামারি। তখন বাগান বন্ধ করে দিতে হয়। এর পরে আমার স্বামী মারা যান। সমস্তটা বুঝে নিতে আমার সময় লাগে। তারপর সরকার এবং ইউনিয়নের সঙ্গে অনেক কথা বলে আমি বাগান খুলেছিলাম। অনেকদিন বন্ধ থাকায় লেবাররা কাজের জন্য অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল। তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু এই সময় বাগানে রহস্যময় ঘটনা ঘটতে লাগল।"

"কীরকম ঘটনা ?"

"আমার বাগানের পাশে নীলগিরি ফরেস্ট। খুব গভীর জঙ্গল। কুলি লাইন ওইদিকেই। কাজের জন্য যখন কুলিরা ফিরে আসছে তখন পর-পর তিন রাত্রে তিনজন খুন হয়ে গেল। কে খুন করছে, কেন করছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

"পুলিশের বক্তব্য কী ?"

"পুলিশ ! কোনও কূলই পাচ্ছে না তারা। অথচ আমার বাগানে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। যারা এসেছিল তাদের অনেকেই আমার বাগান ছেড়েছে। নতুন কাজের লোকের আসার সম্ভাবনা নেই। এমন চললে আমাকে বাধ্য হয়ে বাগান বিক্রি করে দিতে হবে। কিন্তু আমি সেটা চাইছি না। আমার স্বামীর পূর্বপুরুষেরা ওই বাগান তৈরি করেন। বুঝতেই পারছেন।"

"আপনার নাম ?"

"মমতা দত্ত।"

"অমলদাকে ঘটনাটা বলেছেন ?"

"হ্যাঁ। উনি বললেন অন্য একটি কেস নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আপনাকে পুরো ব্যাপারটা জানাতে। পুলিশের ওপর আমি পুরো ভরসা করতে পারছি না।"

"হৈমন্তীপুর চা-বাগানটা ঠিক কোথায় ?"

"হাসিমারার কাছে।"

"দেখুন, এখনই আমি কিছু বলতে পারছি না আপনাকে। আগামীকাল সকালে একটা কেস নিয়ে আলোচনা আছে। সেটা যদি না নেওয়া হয় তা হলে অবশ্যই আপনার ব্যাপারটা দেখব। কিন্তু ওই কেস নেওয়া হলে একদম সময় পাব না।"

মমতা দেবী খুবই বিমর্ষ হলেন। তিনি জানালেন তাঁর টেলিফোন এখনও চালু আছে এবং খবর যা হোক, তা অর্জুন কাল দুপুরের মধ্যেই জানিয়ে দেবে। অর্জুন অবাক হয়ে শুনল ভদ্রমহিলা গাড়ি নিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে মাঝপথে বাসে চেপে জলপাইগুড়িতে এসেছেন, যাতে কেউ যদি অনুসরণ করতে চায় তা হলে বিভ্রান্ত হবে। আজ রাত্রে এখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে কাল সকালে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে যাবেন। তাঁর ধারণা প্রতিপক্ষ সবসময় নজর রাখছে। অর্জুন তাঁকে মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে রিকশর ব্যবস্থা করল। ভদ্রমহিলা যাওয়ার আগে বারংবার অনুরোধ করলেন তাঁকে সাহায্য করতে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে অর্জুনের মনে হল অতীতের পেছনে না ছুটে বর্তমানের সমস্যা সমাধান করা অনেক বেশি উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার। কবে কখন কোথায় কালাপাহাড় তার লুটের সোনাদানা লুকিয়ে রেখেছে এবং সেটা উদ্ধার করে হরিপদ সেনকে তুলে দিতে হবে—এমন অসম্ভব ব্যাপার নিশ্চয়ই অমলদা করতে চাইবেন না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অমলদা ভদ্রলোকের কাছে অ্যাডভান্স নিয়ে ফেলেছেন। বেশিরভাগ কেসেই এটা উনি করেন না। অ্যাডভান্স নিলে কাজটা করবেন বুঝেই নেন। কালাপাহাড়ের সোনা খোঁজা মানে অন্ধকারে হাতড়ানো। হৈমন্তীপুর চা-বাগানের হত্যা রহস্যের তো একটা মোটিভ দেখা যাচ্ছে। মমতা দেবীকে বাগানছাড়া করা। ওই পথে এগোলে হত্যাকারীদের সন্ধান পেতে তেমন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। বাগানটা অনেকদিন বন্ধ ছিল। পাশেই নীলগিরি জঙ্গল। কুলিরা যখন আসতে শুরু করল তখন তাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেশি ছিল না। তাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কোনও দল যদি দু-চারজনকে হত্যা করে আবার জঙ্গলে ফিরে যায় তা হলে আতঙ্ক ছড়াতে বেশি দেরি হবে না।

সকালে বাইক চালিয়ে বেশ উত্তেজিত হয়েই অর্জুন অমল সোমের বাড়িতে চলে এল। অমলদা এবং বিষ্টুসাহেব বাগানেই চেয়ার পেতে বসে চা খাচ্ছিলেন। বিষ্টুসাহেব চিৎকার করে বললেন, "সুপ্রভাত। কাল দুপুরের পর আর দর্শন পেলাম না কেন ?"

ইতিমধ্যে হাবু তৃতীয় চেয়ারটি নিয়ে এল। বসে পড়ল অর্জুন, "কাল বিকেলে জল্পেশের মন্দিরে গিয়েছিলাম। আচমকাই।"

"জল্পেশের মন্দির ? আহা, গেলে হত সেখানে।" বিষ্টুসাহেব মাথা নাড়লেন।

অমল সোম বললেন, "গেলেই হয়। আছেন তো ক'দিন।"

অর্জুন দেখল অমলদা এটুকু বলেই চুপ করে গেলেন। এটাই অস্বস্তিকর। কিন্তু বিষ্টুসাহেবই তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন, "ওই যে, কাল এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, কোনও চা-বাগানের মালিক

যেন···।"

অর্জুন দেখল অমলদা তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সে বলল, "হ্যাঁ, উনি আমার বাড়িতে এসেছিলেন। আপনি কেসটা শুনেছেন অমলদা ?"

"হ্যাঁ। ভদ্রমহিলার দুশ্চিন্তা হওয়া খুবই স্বাভাবিক।"

"আমরা কি কেসটা নিতে পারি ?"

"সময় পাওয়া যাবে না।"

"কেন ?"

"তুমি তো জানো, আজকাল সাধারণ ঘটনা আমাকে একদম টানে না। বরং ওই হরিপদ সেনের ব্যাপারটা ক্রমশ আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে। ওঁর দেওয়া কাগজপত্তরগুলো পড়লাম। এই কেস নিয়ে কাজ করা যায়।"

অর্জুন বলল, "ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গোলমেলে।"

"ঠিকই। তাই আমাকে টানছে। অর্জুন, তুমি কি মনে করো কালাপাহাড়ের মতো একজন ক্ষমতাবান লোক সবাইকে দেখিয়ে একটা জায়গায় মাটি খুঁড়ে সোনামুক্তো পুঁতে রাখবে ? যখন তার জানাই আছে যুদ্ধের প্রয়োজনে কাশী থেকে কামাখ্যা ঘুরে বেড়াতে হয় ? লোকটা নিশ্চয়ই তার নবাবকে লুকিয়ে ওগুলো সরাতে চেয়েছে ! কালাপাহাড়কে এতটা বোকা আমার কখনওই মনে হয়নি।"

অর্জুনের একটু অস্পষ্ট ঠেকল, "কিন্তু হরিপদবাবু বলে গেলেন যে নন্দলাল সেন জানতেন কোথায় কালাপাহাড় ওসব লুকিয়েছেন।"

"কথাটা হরিপদবাবুকে তাঁর ছোটঠাকুর্দা বলেছেন। তিনিও নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বপুরুষদের মুখে শুনে থাকবেন। কথা হল, এতদিন এঁরা চুপ করে বসে ছিলেন কেন ? পুরী থেকে অনেক আগেই তো

অভিযান করতে পারতেন ওঁরা।"

অর্জুনের মনে হল অমলদা ঠিক কথাই বলছেন। বিষ্টুসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "ওই কাগজপত্রে কিছু পেলেন ?"

"হ্যাঁ। সেইটেই ইন্টারেস্টিং। ওগুলো আসলে নন্দলাল সেনের জীবনের বৃত্তান্ত। তাঁর নিজের লেখা নয়। যিনি লিখেছেন তিনি কর্নাটকী শব্দ জানেন। ইচ্ছে করেই হয়তো মানেটাকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। কর্নাটকী আমিও জানি না। যেটুকু বোঝা গেল তাতে নন্দলাল কালাপাহাড়ের পুরী অভিযানের পর একেবারে নিঃশব্দে সরে যান দল থেকে। হয়তো কালাপাহাড়ের অত্যাচার তাঁর আর সহ্য হয়নি। এই দল-ছাড়ার আগে তিনি অনুমতিও নেননি। কালাপাহাড় হয়তো নন্দলালের ওই ধৃষ্টতা মেনে নিত না যদি তাকে জরুরি প্রয়োজনে পুরী থেকে চলে না আসতে হত।"

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। এবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি কালাপাহাড়ের সম্পর্কে সব কিছু জেনেছেন ? মানে যেটুকু জানা সম্ভব ?"

অমলদা হাসলেন, "খুব বেশি কিছু নয়। তুমি যা জেনেছ, তাই। গতকাল বিকেলে আমরা বেড়াতে-বেড়াতে তোমার মাস্টারমশাই-এর কাছে গিয়ে শুনলাম তুমি আমাদের আগেই পৌঁছে গিয়েছ। ভদ্রলোক সারাজীবন ইতিহাস নিয়ে আছেন, অনেক কিছু জানেন। কিন্তু তাঁর জানাতেও বিস্তর অনুমান আছে।"

"আপনি কীভাবে কেসটা শুরু করবেন ?"

"এখনও ভাবিনি। কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে।"

"কালাপাহাড়ের অতীত, মানে জন্মবৃত্তান্ত···· !"

"এইখানে একটা কথা।" অমলদা হাত তুলে থামালেন, "ধরো, কোনও মানুষ খুন হলেন। অপরাধী কে সেটা আন্দাজ করতে পারছ। কিন্তু তার গতিবিধি জানবার জন্য কি তুমি তার বাল্যকাল হাতড়াবে ?"

"না, তা নয়। কিন্তু তার অভ্যেস বা সংস্কার জানবার জন্য পেছনের দিকে হয়তো যেতে হতে পারে। আপনি বলছেন কালাপাহাড় কোনও সাক্ষী রেখে ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখবে না। তা হলে নন্দলাল সেটা জানলেন কী করে ? জানলেও নিজের অংশ নেননি কেন ?"

"দুটো কারণ থাকতে পারে। কালাপাহাড় যে সম্পত্তি পরে ব্যবহার করবে বলে লুকিয়েছিল তা যদি নন্দলালের জানা থাকে তা হলে কালাপাহাড়ের মৃত্যুর পরেই ওঁর মনে হতে পারে এবার ওই সম্পত্তি বেওয়ারিশ, আর কেউ যখন জানে না তখন আমি ভাগ নিই। তা হলে ভাগ কেন ? পুরোটাই তো নিতে পারতেন। মুঘল ফৌজের তোপে কালীগঙ্গার ধারে কালাপাহাড় মারা যায়। তবু হরিপদবাবুর দেওয়া কাগজপত্রে পাচ্ছি—নন্দলাল অংশের কথা বলেছেন। কালাপাহাড় পুরী আক্রমণ করে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে। ধরা যাক, তখনই বা তার কিছু পরে নন্দলাল দলত্যাগ করেন। এর প্রায় পনেরো বছর পরে কালাপাহাড় মারা যায়। ততদিন নন্দলাল পুরীতেই আত্মগোপন করে থাকতে পারেন। কিন্তু কালাপাহাড় মারা যাওয়ার পরে তো নিজেই যেতে পারতেন ধনসম্পদ উদ্ধার করতে !"

অমল সোম চোখ বন্ধ করলেন, "নন্দলাল যাননি। হয় তিনি অসুস্থ ছিলেন, নয় অন্য কারণ ছিল। নন্দলালের কথা যিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তিনিও অংশের কথাই বলেছেন। তা হলে কি আর কেউ নন্দলালের সঙ্গী ছিল ?"

বিষ্টুসাহেব মাথা নাড়লেন, "বাঃ। চমৎকার। দুটো কারণ বলছিলেন, আর-একটা কী ? একটা না হয় অসুস্থতা অথবা অন্য কোনও সঙ্গীর জন্যই যেতে পারেননি ভদ্রলোক।"

অমলদা বললেন, "দ্বিতীয় কারণ খুব সোজা। কালাপাহাড়ের একার পক্ষে অত ধনসম্পদ লুকনো সম্ভব ছিল না। সেইজন্য বিশ্বস্ত অনুচর নন্দলালকে সঙ্গে নিয়ে সেটা করেছেন। তারপর হয়তো আশ্বাস দিয়েছিলেন কিছুটা অংশ পরে দেবেন। কিন্তু পুরীর মন্দির আক্রমণের পরে ভদ্রলোকের মনে অনুতাপ আসে। তিনি তাঁর প্রভুর সঙ্গত্যাগ করেন। ওরকম মনের অবস্থায় লুণ্ঠিত ধনসম্পত্তি সম্পর্কে মনে ঘৃণা জন্মানো অস্বাভাবিক নয়। তাই তিনি কালাপাহাড় মারা যাওয়ার পরেও উদ্ধারের চেষ্টা করেননি। কিন্তু ঘটনাটা ছেলে বা নাতিকে বলেছিলেন। তাঁরাই লেখার সময় ধনসম্পত্তির উল্লেখ করে নিজেদের অংশ দাবি করে বসে আছে। কিন্তু ততদিনে এ-দেশের রাজনৈতিক চরিত্র ঘন-ঘন বদল হচ্ছে। নন্দলালের বংশধরদের পক্ষে ইচ্ছে থাকলেও উদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। আর নন্দলাল তাঁদের বিস্তারিত বলেও যাননি।"

এবার অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এত বছর পরে আমরা জায়গাটা বের করব কী করে ?"

অমলদা হাত নেড়ে হাবুকে ডাকলেন। ইশারায় কাপ-প্লেট তুলে নিতে বললেন। তারপর চোখ বন্ধ করলেন, "কালাপাহাড় কেন ধনসম্পত্তি লুকিয়েছিল ? তার তো প্রচণ্ড প্রতাপ ছিল। নিশ্চয়ই সে চায়নি ওগুলোর কথা অন্য লোক জানুক। এই অন্য লোক সম্ভবত বাংলার নবাব দাউদ খাঁ, কালাপাহাড় যাঁর সেনাপতি। অভিযান করে সেনাপতি যা লুঠ করবে তা অবশ্যই নবাবের প্রাপ্য। যতই প্রতাপশালী সেনাপতি হোক, নবাবের কাছে কালাপাহাড়কে জবাবদিহি করতেই হত। কোনও একটা অভিযান করে রাজধানীতে ফেরার পথে কালাপাহাড় ওগুলো লুকিয়ে রাখে। নন্দলালের বর্ণনা অনুযায়ী মনে হয় জায়গাটা এই উত্তরবঙ্গ। কারণ দাউদ খাঁর রাজধানী ছিল মালদহের তাণ্ডা নামে একটা শহরে। এবার ব্যাপারটা একটু সহজ হয়ে গেল। মালদহে ফেরার পথে উত্তরবঙ্গ যদি পড়ে তা হলে কালাপাহাড় অসম অভিযান করেই ফিরছিল এবং সেটা পুরী অভিযান করার ঠিক আগে। তা হলে ওর ওই ফেরার পথ ধরে আমাদের এগোতে হবে।"

ঠিক এই সময় একটা জিপ এসে গেটের সামনে থামল। অর্জুন দেখল জিপ থেকে থানার দারোগা শ্রীকান্ত বকসি নামছেন। সে এগিয়ে গেল। শ্রীকান্তবাবু গেট খুলে কাছে এসে বললেন, "মিস্টার সোম, আপনাদের একটু বিরক্ত করতে এসেছি। স্রেফ রুটিন কাজ।"

অমলদা বললেন, "স্বচ্ছন্দে।"

"হরিপদ সেন গতকাল আপনার কাছে এসেছিলেন। কী কথা হয়েছে ?"

"কী ব্যাপার ? আপনি আমার ক্লায়েন্টের ব্যক্তিগত কথা জানতে চাইছেন কেন ?"

শ্রীকান্ত বকসি গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, "আজ সকালে হরিপদবাবুকে তাঁর হোটেলে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশ একটু আগে জানাল।"

অমলদা চমকে উঠলেন, "সে কী ! হরিপদবাবু মারা গিয়েছেন ?"

শ্রীকান্ত বকসি মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ। ওঁকে খুন করা হয়েছে।"

আক্ষেপে হাত ছুঁড়লেন আকাশে অমলদা, "ইস। ভদ্রলোককে বললাম জলপাইগুড়ির কোনও হোটেলে থাকতে, কিন্তু কথাটা শুনতেই চাইলেন না।"

"আপনি কি ওঁর কথা শুনে কিছু আন্দাজ করেছিলেন ?"

"না। উনি আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেটা নেব কি না তা ভাবতে একদিন সময় নিয়েছিলাম। ইন ফ্যাক্ট আপনার বদলে এখন হরিপদবাবুকেই আশা করছিলাম। আজ সকালে ওঁকে জানিয়ে দিতাম ওঁর প্রস্তাবে আমি রাজি। শিলিগুড়ি থেকে যাওয়া-আসা না করে আমি তাই ওঁকে জলপাইগুড়িতেই থাকতে বলেছিলাম।"

"উনি রাজি হননি ?"

"না, বললেন সেখানে জিনিসপত্র রেখে এসেছেন। অথচ…।"

"উনি কী প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন ?"

হাত নাড়লেন অমলদা। খুব হতাশ দেখাচ্ছিল তাঁকে, "সেটা কি আমি বলতে বাধ্য ?"

"হয়তো ওঁর খুনের কোনও ইঙ্গিত আমরা পেতে পারি। ইন ফ্যাক্ট, ওঁর হোটেলের ঘরে আপনার নাম-ঠিকানা লেখা একটা কাগজ পাওয়া গিয়েছে যার জন্য শিলিগুড়ি পুলিশ আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারে।"

অমলদা একটু চিন্তা করলেন, "উনি আমাকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে গিয়েছিলেন, ওঁর কাগজপত্রও আমার কাছে। কিন্তু আমার সন্দেহ ওঁর কাছে আরও কিছু ছিল যা আমাকে বিশ্বাস করে দিতে পারেননি। যা হোক, ওঁকে যখন ক্লায়েন্ট বলে ভেবেছি তখন ওঁর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা আমার নৈতিক কর্তব্য। মিস্টার বকসি, উনি আমার কাছে এসেছিলেন গুপ্তধন উদ্ধার করতে সাহায্য চাইতে।"

"গুপ্তধন ?" শ্রীকান্ত বকসি হতভম্ব।

"আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে মাটিতে পুঁতে রাখা ধনসম্পত্তি, যা ঠিক কোথায় আছে তিনি জানেন না।"

"তা হলে খুঁজবেন কী করে ?"

"সেই কারণেই ওঁর কাছে একদিন সময় চেয়েছিলাম।"

"আচ্ছা ! তা হলে হত্যাকারী এই গুপ্তধনের খবর জানত !"

"মনে হচ্ছে তাই।" অমলদা উঠে দাঁড়ালেন, "আমরা একবার শিলিগুড়িতে যেতে চাই। ওঁর হোটেলে। সাহায্য করবেন ?"

"নিশ্চয়ই। আমিও যাচ্ছিলাম। আপনারা আমার সঙ্গে আসতে পারেন।"

"আপনি কেন যাচ্ছিলেন ?"

"পুলিশের কাজ মশাই। ছুটোছুটিই তো আমাদের চাকরি।"

বিষ্টুসাহেব বাড়িতেই থেকে গেলেন। অর্জুন আর অমল সোম দারোগাবাবুর জিপে উঠে বসতেই চাকা গড়াল। অর্জুনের মনে পড়ল গতকাল হরিপদবাবু এই সময় বেঁচে ছিলেন। এই বাড়ির গেট দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে উঠেছিলেন। আজ তিনি নেই। কে সেই লোক যে একজন অংশীদার কমিয়ে দিল ? (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

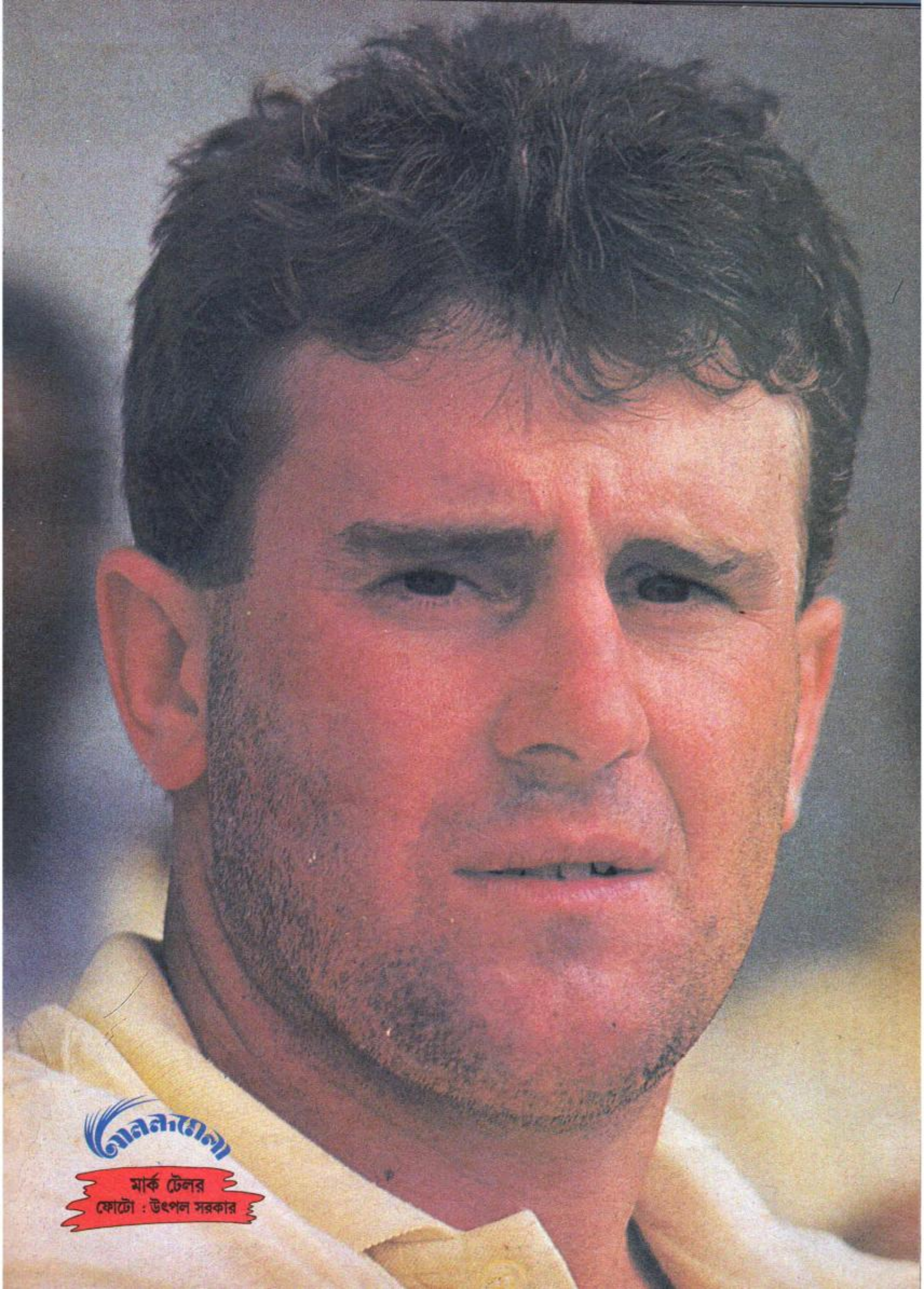

মার্ক টেলর
ফোটো : উৎপল সরকার

খেলাধুলো

চমক দূরপাল্লার সাঁতারে

আঠারো বছরের যুবক সুখবিন্দার ও আট বছরের মেয়ে নিবেদিতা
—এই দুই সাঁতারুকে নিয়ে লিখেছেন **তমাল মুখোপাধ্যায়**

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর থেকে বহরমপুরের গোরাবাজার সদরঘাট। ভাগীরথীবক্ষে এই ৮১ কিলোমিটার পথে অনুষ্ঠিত বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা। দূরপাল্লার এই সাঁতারে এবার বিজয়ী হয়েছেন মহারাষ্ট্রের সুখবিন্দার সিং। তাঁর বয়স ১৮। ১৯৭৮ সালে এন· আই· এস· কোচ দেবী দত্তের কাছে তিনি প্রথম সাঁতার শিখতে শুরু করেন। জীবনের প্রথম সাফল্য পান কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে। কলেজ স্কোয়ারে এক সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিনি দ্বিতীয় হয়েছিলেন। আর এবার বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে তিনি এক অসাধারণ কৃতিত্বের নজির

দূর-দূরান্ত থেকে এসেছিলেন সাঁতারুরা

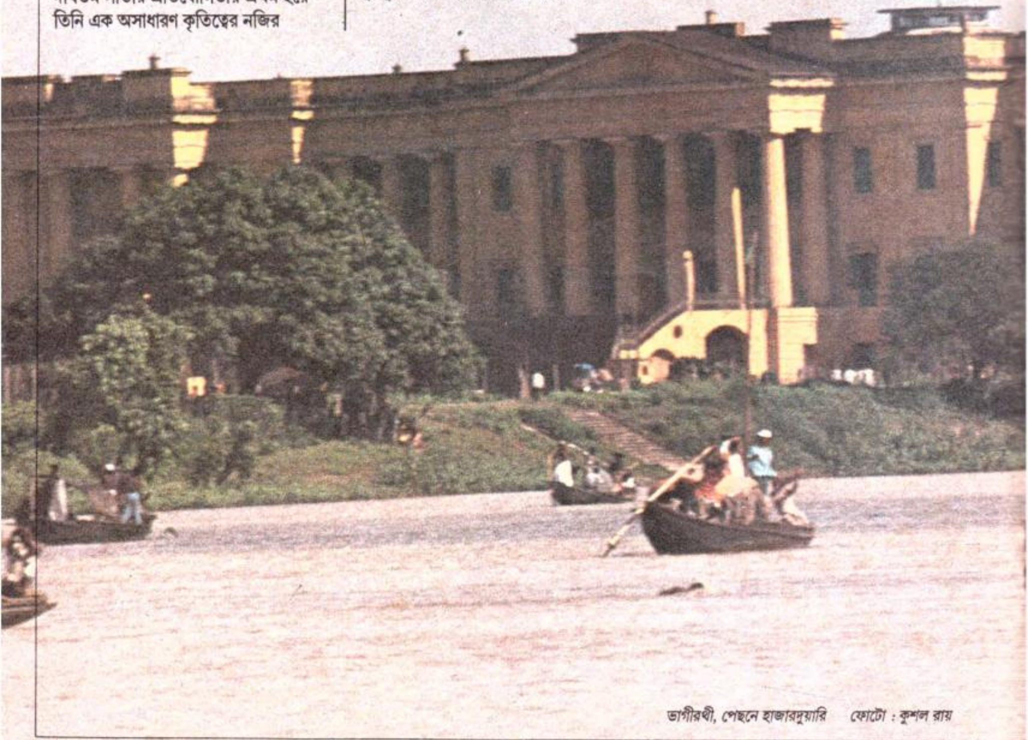

ভাগীরথী, পেছনে হাজারদুয়ারি   *ফোটো : কুশল রায়*

শ্রীরামপুর শিশু শিক্ষায়তনের ক্লাস ফোর-এর ছাত্রী নিবেদিতা সাহা। তার বয়স মাত্র আট। এই বয়সেই সে দারুণ সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে। সুখবিন্দারের বয়স আঠারো। সঞ্জীবন মণ্ডল এর আগে পর পর চার বছর এই সাঁতারে প্রথম হয়েছিলেন। সুখবিন্দার তাঁর আসনটি টলিয়ে দিলেন।

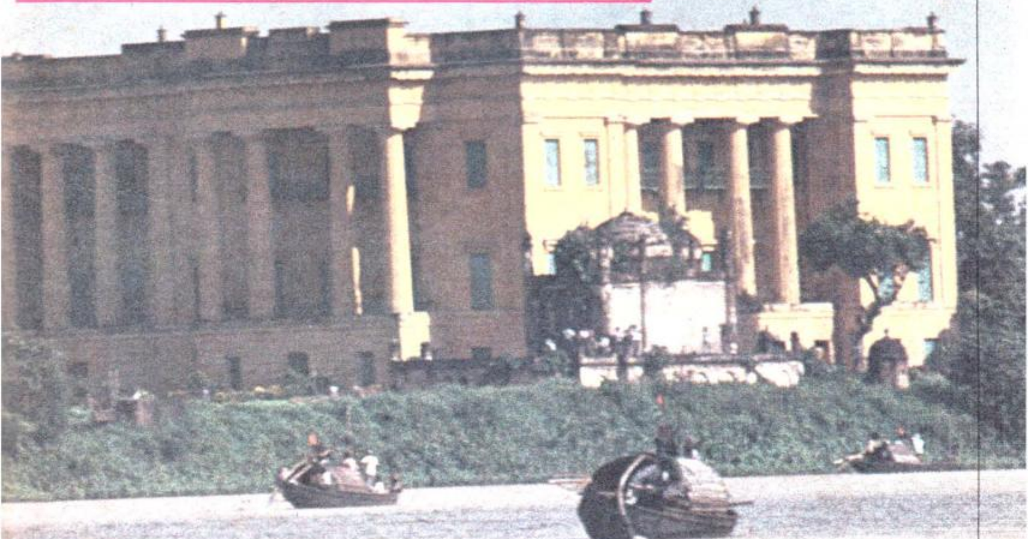

রাখলেন। এরকম একটা সাঁতার প্রতিযোগিতায় এই প্রথম তিনি অংশ নিলেন। প্রথমবারেই বাজিমাত করেছেন। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছেন বাংলার সঞ্জীবন মণ্ডল। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন প্রতুল রায়। সুখবিন্দার সম্পর্কে জানা গেল, এই বয়সেই তিনি নানা সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন এবং পেয়েছেন প্রচুর সোনা ও রুপো। বোম্বাইয়ের আর· সি· কলেজের বি· কম· প্রথম বর্ষের ছাত্র সুখবিন্দার। ৮১ কিলোমিটার পথ সাঁতরাতে তিনি সময় নিয়েছেন ১১ ঘণ্টা ১৬ মিনিট ২৯ সেকেন্ড। এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা হল মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন। ৮১ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতা ছাড়াও আরও দুটি সাঁতার প্রতিযোগিতার তারা আয়োজন করে। পুরুষ ও মেয়েদের ১৯ কিলোমিটার সাঁতারের দুটি প্রতিযোগিতা। চমক ছিল এবারের এই প্রতিযোগিতাগুলিতে। সুখবিন্দার এসেছিলেন পুরুষদের ১৯ কিলোমিটার সাঁতারে অংশ নিতে। কিন্তু এসে শুনলেন তাঁর নাম ৮১ কিলোমিটারে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে সুখবিন্দার ও তাঁর বাবা রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু জেদী ছেলে সুখবিন্দার হতাশ হননি। তিনি ৮১ কিলোমিটার সাঁতারেই নামলেন এবং প্রথম স্থানটি দখল করে সবাইকে রীতিমত অবাক করে দিলেন। তিনি উদ্যোক্তাদের সামনেই বাবাকে কথা দিয়েছিলেন, 'প্রথম হয়েই যোগ্য জবাব দেব।' কথাটা তিনি বেশ ভালভাবেই রেখেছেন।

পুরুষদের ১৯ কিলোমিটারে প্রথম হয়েছেন বাংলার অমর বসাক, দ্বিতীয় ত্রিপুরার শঙ্কর দাস এবং তৃতীয় বাংলারই সুবীর সরকার। মেয়েদের ১৯ কিলোমিটার সাঁতারে প্রথম হয়েছেন বাংলার স্বাগতা ভৌমিক, দ্বিতীয় ত্রিপুরার জামাথিয়া ও তৃতীয় অসমের গীতাঞ্জলি চৌধুরি। এবার সবচেয়ে অবাক করেছে আট বছরের মেয়ে নিবেদিতা সাহা। ১৯ কিলোমিটার সাঁতারে নেমে বড়দের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে নিবেদিতা শেষ পর্যন্ত অষ্টম স্থান দখল করে। অষ্টম হলেও তার কৃতিত্ব কোনও অংশে কম নয়। বরং যে সম্ভাবনা সে এখনই জাগিয়ে তুলল, তা তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের আশাবাদী করে তুলেছে।

অ্যালান বর্ডার

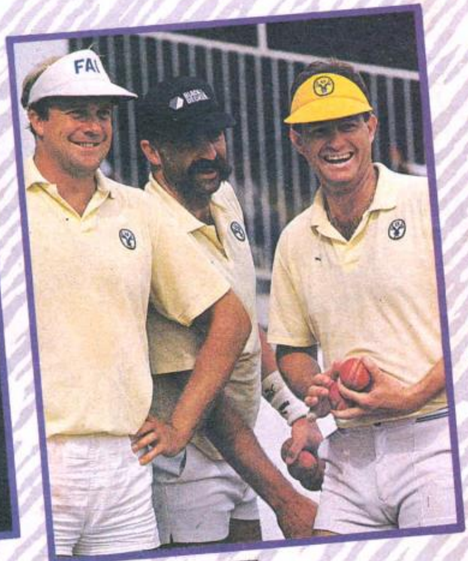

রেকোম্যান, মাভ হিউজ ও অল্ডারম্যান

জমবে 'অ্যাশেজ' সিরিজ

গ্রাহাম গুচের সামনে সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ।
লিখেছেন **অনির্বাণ দত্ত**

অ্যালান বর্ডার-এর অস্ট্রেলিয়া দলকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হারানোর কাজটি অত্যন্ত কঠিন। লড়াকু দল বলে অস্ট্রেলিয়ার সুনাম আছে। তার ওপর আবার ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং—ক্রিকেটের এই তিনটি বিভাগেই তারা সমান শক্তিশালী। বর্তমান বিশ্বের কোনও ক্রিকেট দলের সমস্ত বিভাগেই এরকম ভারসাম্য দেখা যায় না। সুতরাং, গ্রাহাম গুচ-এর ইংল্যাণ্ড দলের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ। সত্যি বলতে কি, ভারতকে টেস্ট-সিরিজে হারানোর কাজটি তত কঠিন ছিল না। ভারতীয় দলের বোলিং অত্যন্ত দুর্বল। সেই বোলিংয়ের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় গড়েছেন ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এবার তাঁদের সত্যিকারের পরীক্ষা।
তবে পরীক্ষা যতই কঠিন হোক, 'অ্যাশেজ' লড়াই যে জমবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সফরকারী ইংল্যান্ড দলে গ্রাহাম গুচ ছাড়াও আছেন আথারটন, রবিন স্মিথ, অ্যালান ল্যাম ও ডেভিড গাওয়ার-এর মতো ব্যাটসম্যান। গুচ ও আথারটন জুটি ভালভাবেই ইনিংসের গোড়াপত্তন করার ক্ষমতা রাখেন। রবিন স্মিথ, অ্যালান ল্যাম ও ডেভিড গাওয়ারও সুদক্ষ ব্যাটসম্যান। উইকেট কিপার জ্যাক রাসেলও ব্যাটে কম যান না। এঁরাই ইংল্যান্ড

স্টিভ ও

ডিন জোন্স

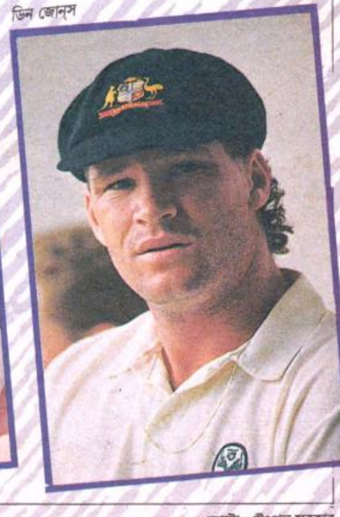

ফোটো : উৎপল সরকার

দলের ব্যাটিংয়ের মূল শক্তি।

অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় ইংল্যান্ডের বোলিং কিন্তু দুর্বল। ডেভ ম্যালকম ও অ্যাঙ্গাস ফ্রেজার তাঁদের বড় অস্ত্র। ক্রিস লুইসও সমানে পাল্লা দেবেন। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যালকম ততটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেননি। অথচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে তিনি একাই ধরাশায়ী করে দিয়েছিলেন। একটা কারণ অবশ্য, ইংল্যাণ্ডের পিচ। ইংল্যাণ্ডে এরকম মন্থর পিচ বহুদিন দেখা যায়নি। আশা করা যায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতোই 'ফাস্ট' পিচ পাবেন ম্যালকম। কারণ, অস্ট্রেলিয়া দলের বোলিংয়েরও মূল শক্তি ফাস্ট বোলাররা। নিজেদের দলের স্বার্থেই তাঁদের ফাস্ট পিচ তৈরি করতে হবে। সেক্ষেত্রে, ম্যালকমকেও হয়তো ছাড়িয়ে যাবে অ্যাঙ্গাস ফ্রেজার। গুচ

অ্যালান ল্যাম

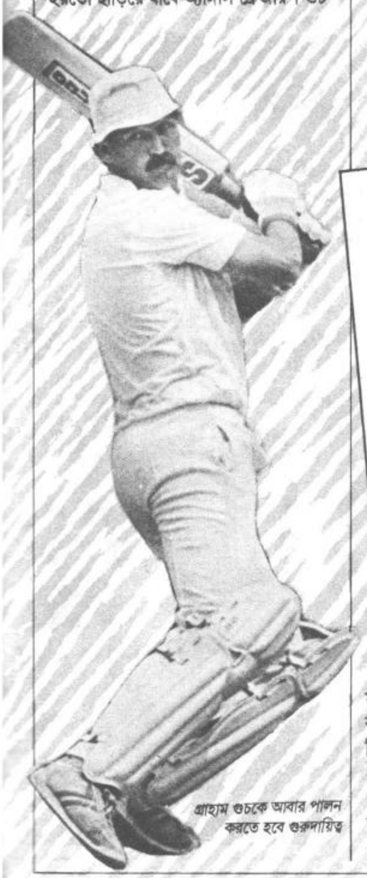

গ্রাহাম গুচকে আবার পালন করতে হবে গুরুদায়িত্ব

ভারতীয় দলের দুর্বল বোলিংয়ের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় গড়েছেন ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এবার তাঁদের সত্যিকারের পরীক্ষা। তবে পরীক্ষা যতই কঠিন হোক, 'অ্যাশেজ' সিরিজ যে জমবে তাতে সন্দেহ নেই।

যদি ফ্রেজারকে একটানা বেশিক্ষণ বল না করিয়ে দফায় দফায় ব্যবহার করেন তা, হলে তিনি হয়ে উঠবেন রীতিমত ভয়ঙ্কর। কারণ, একটানা ভাল বল করার ক্ষমতা নেই ফ্রেজারের। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরাও ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের তুলনায় অনেক বেশি পেশাদার। ফলে, ফ্রেজার লাইন ও লেংথ-এ একটু বিপথগামী হলেই তাঁরা তাঁকে ছেড়ে কথা বলবেন না।

বস্তুত, অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং যথেষ্ট শক্তিশালী। অ্যালান বর্ডার পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাট করেন। তাঁর ব্যাট থেকে আসে প্রচুর রান। আছেন ন্যাটা ওপেনার মার্ক টেলর। ব্যর্থতা কথাটাই বোধ হয় তাঁর অভিধানে নেই। কম্পিউটার র‍্যাঙ্কিং-এ তিনিই এখন বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটসম্যান। তাঁর সঙ্গে ইনিংসের গোড়াপত্তন করবেন জিওফ মার্শ, না হয় ডেভিড বুন। কেউ কারও চেয়ে কম যান না। আছেন ডিন জোন্‌স। গত কয়েক বছর ধরে তিনি দুর্দান্ত ফর্মে আছেন। ফাস্ট ও 'স্পিন'-যে-কোনও ধরনের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে তিনি চটপট রান তোলার ক্ষমতা রাখেন। আর আছেন স্টিভ ও। তাঁকে আউট করতে হিমশিম খাবেন ইংল্যাণ্ডের বোলাররা।

অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়ার বোলিংয়ের বড় অস্ত্র টেরি অল্ডারম্যান। এই টেরি অল্ডারম্যানই এর আগে ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের বিভীষিকা হয়ে উঠেছিলেন। এবারও ইংল্যাণ্ডের ব্যাটসম্যানরা সহজে ছাড়া পাবেন না। কার্ল রেকোম্যান-এর বোলিংও মারাত্মক হয়ে উঠবে।

দুই জার্মানি মিলনের পর সেরা শক্তি হবে

ওলিম্পিক, বিশ্বকাপ ফুটবল ও আন্তজাতিক অন্যান্য খেলাধুলোর আসরে জার্মানি সবাইকে টেক্কা দেবে । লিখেছেন তানাজি সেনগুপ্ত

কার শক্তি বেশি ? এতদিন খেলাধুলোর জগতে এই লড়াই মূলত সীমাবদ্ধ ছিল দুই বৃহৎ দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে । তৃতীয় শক্তি হিসেবে কখনও দেখা যেত পশ্চিম জার্মানিকে, কখনও পূর্ব জার্মানিকে । অর্থাৎ প্রথম স্থানটির দাবিদার সর্বদাই ছিল ওই দুই দেশ । এবার ছবিটার পরিবর্তন হতে চলেছে । আগামী ওলিম্পিকেই দেখা যাবে একত্রিত জার্মানি প্রথম স্থানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে । দ্বিপাক্ষিক লড়াইয়ের জায়গায় তখন দেখা যাবে ত্রি-পক্ষের তীব্র সংগ্রাম । ব্যাপারটা যে উপভোগ্য হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই ।

সোল ওলিম্পিকে সর্বাধিক পদক পেয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৩২টি । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৯৪টি । পূর্ব জার্মানির স্থান ছিল পদকতালিকায় দ্বিতীয়, ১০২টি । পশ্চিম জার্মানি পেয়েছিল ৪০টি পদক । অর্থাৎ দুই জার্মানির মিলিত পদক-সংখ্যা ধরলে তা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ছাড়িয়ে যায়, ১৪২টি । বোঝাই যায়, প্রথম স্থানটি জার্মানির বাঁধা ছিল । কিন্তু তা হয়নি, যেহেতু দুটি আলাদা দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন দু' দেশের সেরা খেলোয়াড়রা । আগামী বার্সিলোনা ওলিম্পিকে যখন এই সেরা খেলোয়াড়রা একসঙ্গে লড়াই করবেন তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা বেশ অসুবিধেয় পড়বেন ।

বেশ কয়েকজন সেরা পুরুষ অ্যাথলিট আছেন দুই জার্মানিতে । পূর্ব জার্মানির সেরা সম্পদ শটপাটার উলফ টিমারম্যান এবং বিশ্বরেকর্ডকারী ডিসকাস থ্রোয়ার জুরগেন স্লুট । পশ্চিম জার্মানিতে আছেন হাইজাম্পার ডিটমার মোগেনবার্গ এবং মিডল ডিসট্যান্ট রানার পিটার ব্রাউন ও ডিটার বাউম্যান । নামগুলো দেখলেই বোঝা যায়, পুরুষ অ্যাথলেটে জার্মানি কত শক্তিশালী ।

শক্তির দিক দিয়ে মহিলারাও কম যান না । পূর্ব জার্মানিতে আছেন স্লিক মোলার, হেইক ড্রেশলার, পশ্চিমে শটপাটার ক্লদিয়া লসচ প্রমুখ । বিশ্বচ্যাম্পিয়ান সাঁতারু হেইক ফ্রিডরিচ দুই জার্মানির মিলনে খুশি হলেও একটা দুঃখের কথাও শুনিয়েছেন । তিনি বলেছেন, "এবার থেকে আর জেতার পর পূর্ব জার্মানির জাতীয় সঙ্গীত শুনতে পাব না ।"

পূর্ব আর পশ্চিম জার্মানি মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্তে সামগ্রিকভাবে দু' দেশের ক্রীড়া-জগতের অনেক লাভ হয়েছে । পূর্ব জার্মানির খেলোয়াড়রা আর্থিক সুযোগ এবার থেকে অনেক বেশি পাবেন । এতদিন তারা স্পনসরার পেতেন না । পশ্চিম জার্মানিতে

ফুটবলে মিলিত জার্মান দল অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবে । (ইনসেট) বিশ্বখ্যাত সাঁতারু হেইক ফ্রেডরিচ

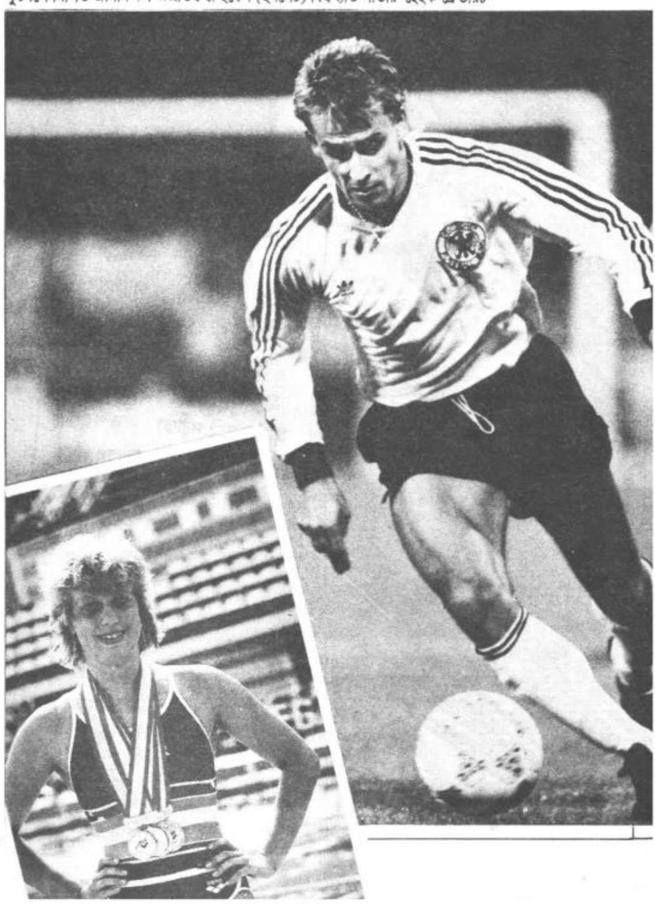

তার অভাব নেই। ইতিমধ্যেই পূর্ব জার্মানির ১৫০ জন সেরা অ্যাথলেটের নাম পশ্চিমের স্পনসর তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পশ্চিমে তাঁরা প্র্যাকটিসও করছেন নিয়মিত। লাইফৎজিগ ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউটে নিয়মিত শিক্ষা নিচ্ছেন পশ্চিমের খেলোয়াড়রা।

ফুটবলে পশ্চিম জার্মানি অনেক শক্তিশালী। পশ্চিম জার্মানির বুন্দেশলিগা পৃথিবীর অন্যতম কঠিন প্রতিযোগিতা, তুলনায় পূর্ব জার্মানির ওবারলিগা অনেক কম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। ঠিক হয়েছে, আগামী বছরেই দুটি লিগ মিশে গিয়ে একটিই প্রতিযোগিতা হবে এবং ভবিষ্যতে এখানকার দক্ষতার ওপরই ওলিম্পিক ও বিশ্বকাপের দল

মহিলাদের অ্যাথলেটিক্সে জার্মানিই বিশ্বসেরা

গড়া হবে। তবে ইতিমধ্যে এ-বছরেই পূর্ব জার্মানির বেশ কয়েকজন নামী ফুটবলার—যেমন, বায়ের লেবারকুশেন, আন্দ্রেস থম, উলফ ক্রিস্টেন দল বদলে পশ্চিমের নামী দলগুলোতে চলে গিয়েছেন। সংখ্যাটা প্রায় ৩০। গত বছর যা অর্থ পেয়েছিলেন তার থেকে অন্তত পঞ্চাশ গুণ টাকা এঁরা এবার বেশি পাবেন বুন্দেশলিগায় খেলে।

পশ্চিম জার্মানি এখন ফুটবলে সেরা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত। বিশ্বফুটবলে তারা চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। পূর্বের সেরা খেলোয়াড়রা এর সঙ্গে যোগ দিলে জার্মান দল যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। টেনিসে আছেন পশ্চিমের দুই সেরা স্টার স্টেফি গ্রাফ এবং বরিস বেকার। বক্সিং এবং সাইক্লিং-এ পূর্ব জার্মানিতে আছেন অসাধারণ কয়েকজন প্রতিভাবান।

সব মিলিয়ে খেলার যে-কোনও ক্ষেত্রেই দুই জার্মানি যে এখন সব দেশের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার জন্য তৈরি, তা বলা যায়।

কেন পিছিয়ে অন্যান্য দেশ

চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনায় এশিয়ার অন্যান্য দেশ এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। কেন এমন হল ? এর সম্ভাব্য কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন **শিবাজি ঘোষ**

একটা সময় ছিল যখন আমেরিকার কলেজ দলগুলি বাস্কেটবলে এশিয়ার সেরা দেশগুলির জাতীয় দলকে অবলীলায় হারিয়ে দিত। ইউরোপের স্কুল-ছাত্ররা অ্যাথলেটিকসে এশিয়ার সেরাদের নিয়ে ছেলেখেলা করত ট্র্যাকে। এশিয়ান গেম্‌স বলতেই ইউরোপ-আমেরিকার সাংবাদিকরা নাক সিঁটকোতেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নেই। সম্মানজনক অনেক ইভেন্টে এখন এশীয়রা বিশ্বমানের। চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া বারবার প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, বিশ্বমানের খেলোয়াড় তারাও তৈরি করতে পারে। এ সত্ত্বেও এশিয়ান গেমসের জৌলুস কিন্তু বাড়ছে না। এশিয়াড বলতে কি শুধুই চিন, জাপান আর দক্ষিণ কোরিয়ার পদক জয় আর বাকি দেশগুলির শূন্য হাতে দেশে ফেরা ?

ফুটবলে যে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি বিশ্বকাপের ফাইনাল রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা পায়, সেই একই দেশ এশিয়াডে তেমন সুবিধে করতে পারে না অন্যান্য খেলায়। ওয়েট লিফটিং-এ আগে ইরানিরা খুব সহজেই সোনা জিততেন এশিয়াডে, এখন আর সেই গৌরবজনক দিনগুলি ফিরে আসে না। ফুটবল ছাড়া গত এশিয়াডে সৌদি আরবের কোনও অস্তিত্বই নেই। বাহরিনের আহমদ হামাদা সোল এশিয়াডে ৪০০ মিঃ হার্ডলসে এশীয় রেকর্ড করে সোনা জিতেছিলেন। তাঁকে বলা হয় এশিয়ার এডুইন মোজেস। কিন্তু ওই একজনই। এ ছাড়া বাহরিন গত এশিয়াডে বিশেষ কিছুই করতে পারেনি। একটি-দুটি রুপো বা পাঁচটি ব্রোঞ্জ কিছুই প্রমাণ করে না। ইরাক পেয়েছিল পাঁচটি রুপো আর দুটি ব্রোঞ্জ। এবারে ইরাককে অংশ নিতে দেওয়া হল না। কুড়ি বছর পরে এশিয়াডে এবার অংশ নিল তাইওয়ান। বাংলাদেশ, নেপাল, ওমান, শ্রীলঙ্কা এখনও প্রস্তুতির দিক থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পড়ে আছে। উন্নত মানের ট্র্যাকের অভাব, নিম্ন মানের কোচিং আর উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনের সুযোগ না থাকাই এই দেশগুলিকে খেলাধুলোর জগতে অনেক পিছিয়ে রেখেছে। অদূর ভবিষ্যতে উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। প্রথম এশিয়াড থেকেই বাস্কেটবল, শুটিং, সাঁতার প্রভৃতি ইভেন্টে ফিলিপিনস যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ম্যানিলার দ্বিতীয় এশিয়াডে পুরুষদের সাঁতারের দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপে ফিলিপিন্‌সের পয়েন্ট ছিল জাপানের সমান। কিন্তু পরবর্তীকালে বারবার পিছিয়ে পড়েছে ফিলিপিনস। ১৯৫১, '৫৪, '৫৮ – পর পর তিনটি এশিয়াডে বাস্কেটবলে ফিলিপিনসের ধারে-কাছে কেউ ছিল না। অ্যাথলেটিক্‌সেও দেশটি ছিল অন্যতম প্রধান শক্তি। আসলে বিশ্বের খেলাধুলোর জগৎটা

লিডিয়া দিয়েছেন ফিলিপিন্‌সকে অনন্য সম্মান

এমনই যে, গৌরবময় অতীত আঁকড়ে ধরে থাকলেই পতন অনিবার্য। ঠিক তাই ঘটেছে ফিলিপিনসের ক্ষেত্রে। বর্তমানে ফিলিপিন্‌সের অবস্থা যে এখন মোটেই ভাল নয় এটাই বড় কথা। লিডিয়া ছিলেন না যে, এশিয়ার দ্রুততমা মহিলার সম্মান এনে দেবেন ফিলিপিনসকে। ব্যাডমিন্টনে লিয়েম সুই কিংয়ের মতো প্রতিভা আবিষ্কার করতে না পারায় ইন্দোনেশিয়াকে ব্যাডমিন্টন কোর্টে চিনা আর কোরীয়দের কাছে নেহাতই শিশু মনে হয়েছে। এইসব ঘটনা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট। এশীয় খেলাধুলোর পট বদলাচ্ছে। একদিকে বাড়ছে চিন আর দক্ষিণ কোরিয়ার পদকসংখ্যা, অন্যদিকে পদক কমে যাচ্ছে জাপান এবং অন্য দেশগুলির। এইভাবে চলতে থাকলে এশিয়াড তার জৌলুস হারাতে বাধ্য।

জাপান, চিন বা দক্ষিণ কোরিয়ার সমপর্যায়ে উঠে আসতে গেলে অন্য দেশগুলিকে খেলাধুলোর পেছনে অনেক বেশি সময় ব্যয় করতে হবে, যা বাস্তবসম্মতভাবে বিচার করলে অলীক কল্পনা বলে মনে হয়। একজন চিনা বা একজন কোরীয় ছেলেবেলা থেকে খেলাধুলোর জন্য যে সুযোগ বা উৎসাহ পান, এশিয়ার অন্যান্য দেশের কমবয়সী খেলোয়াড়রা তা কল্পনাও করতে পারবেন না। এই ধরনের একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এশিয়ার স্বল্পখ্যাত দেশগুলির খেলোয়াড়দের পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে আসার জন্য কঠিন লড়াই করতে হয়। চিন-জাপান-কোরিয়ার খেলোয়াড় না হয়েও যে এশিয়ার সেরা হওয়া যায়, আমাদের উষা বারবার তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কাতারের সামরিক বাহিনীর সার্জেন্ট তালাল মনসুরই এশিয়ার দ্রুততম পুরুষ। কাতারের মতো একটি ছোট দেশ থেকেও যদি এশিয়ার সেরা অ্যাথলিট উঠে আসতে পারে, তা হলে আমাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আসলে অভাব হচ্ছে উপযুক্ত মানসিকতার। হারবার আগেই আমরা হেরে বসে থাকি।

কানাজাওয়া বলে গেলেন শিষ্য ব্রুস লি-র কথা

গুরু কানাজাওয়া শিষ্য ব্রুস লি-র প্রতি কৃতজ্ঞ।
লিখেছেন **হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়**

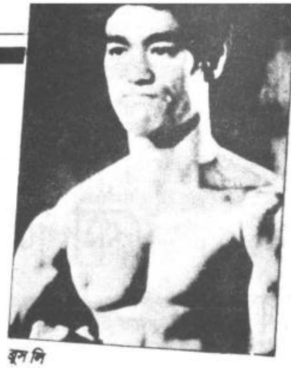

ব্রুস লি

শিষ্য ব্রুস লিকে ভুলবেন না কানাজাওয়া

ব্রুস লি-র গুরু হিরো কাজু কানাজাওয়া কিছুদিন আগে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর বয়স ৫৮। চোখে-মুখে বয়সের ছাপ পড়লেও মনের দিক থেকে তিনি এখনও যুবক। তাঁর শিষ্য ব্রুস লি-র নাম এখন ঘরে-ঘরে, কিন্তু গুরু হিসেবে কানাজাওয়া পেয়েছেন অনন্য সম্মান।
পাঁচ বছর বয়সে কানাজাওয়া 'মার্শাল আর্ট' শেখা শুরু করেন ফুনোকোশি ও নাকায়ামার কাছে। জাপানি প্রথায় ক্যারাটে শেখার আগে ও পরে সেই সময় তাঁকে ভারতীয় যোগব্যায়ামও শেখানো হত। সেই তখন থেকেই ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কানাজাওয়া।
গুরুদের কাছে ক্যারাটের কলাকৌশলগুলি নিখুঁতভাবে শিখে নিয়েছিলেন তিনি। ক্রমে তিনি নিজেই হলেন গুরু। আস্তে-আস্তে তাঁর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বাড়তে থাকল। বাড়তি ছাত্রছাত্রীর চাপ সামলাতে না পেরে কানাজাওয়া একজন সহকারী রাখেন। ব্রুস লি যখন তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালিম নিতে আসেন তখন ওই সহকারীর কাছেই তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষা নিতে হয়েছিল। ক্যারাটে শিক্ষায় প্রথম থেকেই ব্রুস লি নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন। অচিরেই তিনি কানাজাওয়ার চোখে পড়ে যান। এর পর সরাসরি তিনি গুরুর কাছে তালিম নিতে শুরু করেন। চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য এক সময় ব্রুস লি-র কাছে ডাক আসে। নিষেধ করেছিলেন কানাজাওয়া। ব্রুস লি নিজেও প্রথম দিকে বেশ দোটানায় পড়েছিলেন। কিন্তু পরে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেননি। চলচ্চিত্রের রঙিন হাতছানি ব্রুস লি-র জীবনটাকেই বদলে দেয়। সারা পৃথিবীজোড়া খ্যাতি তিনি অর্জন করেন। ব্রুস লি-র চেয়েও বড়-বড় ক্যারাটেকা আছেন। কিন্তু ব্রুস লি-র মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতি তাঁরা অনেকেই পাননি। চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুবাদে দুঃসাহসী ব্রুস লি-র যে ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়েছে, তা এক কথায় অভূতপূর্ব।
ব্রুস লি-র যেমন নাম হয়েছে, তেমনই ক্যারাটেও জনপ্রিয় হয়েছে দেশে-দেশে। ড্রাগন সিরিজের ছবিগুলিতে বস্তুত ক্যারাটে ছাড়া ব্রুস লি-র অভিনয় দেখানোর সুযোগ তেমন ছিল না। কিন্তু তিনি তাতেই সারা বিশ্বের তরুণ-তরুণীদের মুগ্ধ করেছিলেন। কলকাতায় কথা প্রসঙ্গে কানাজাওয়াও কথাটা স্বীকার করেছেন। চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণের জন্য তিনি ব্রুস লি-র ওপর অসন্তুষ্ট হলেও এই মুহূর্তে তাঁর প্রতি কানাজাওয়ার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কানাজাওয়ার মতে, ব্রুস লি-র জন্যই মার্শাল আর্ট তথা ক্যারাটে পৃথিবীতে এত জনপ্রিয় হয়েছে। তিনি বলেছেন, "অতীতে এমন ব্যাপকভাবে ক্যারাটের প্রচলন ছিল বলে মনে হয় না। আমি অবাক হয়ে ভাবি, ব্রুস লি কোন জাদুতে সারা পৃথিবীর লক্ষ-লক্ষ ছেলেমেয়েকে ক্যারাটের প্রতি এমন আগ্রহী করে তুলল! একটা বিজ্ঞানসম্মত শিল্পকে এরকম একক প্রচেষ্টায় সারা বিশ্বের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নজির আর আছে কি না সন্দেহ।"
কানাজাওয়া বলেছেন, "ক্যারাটের জনপ্রিয়তা দেখে মনে হচ্ছে, আগামী শতকেও সারা পৃথিবীর কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীরাও এর জোয়ারে ভেসে যাবে। এখন অভিভাবকরাও চাইছেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা ক্যারাটে শিখুক। এই উদ্দীপনা সৃষ্টির পুরো কৃতিত্বই ব্রুস লি-র।
ব্রুস লি সম্পর্কে কানাজাওয়া আরও জানিয়েছেন, "চলচ্চিত্রে অভিনয় করার সময় তার প্র্যাকটিসের সময় কমে গিয়েছিল। অথচ সে যখন আমার কাছে তালিম নিত তখন প্র্যাকটিস ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনও চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিত না। এমনকী, প্র্যাকটিস ম্যাচকেও সে দারুণ গুরুত্ব দিত। মনে পড়ে, অসুস্থতার জন্য একবার সে দিন দুয়েকের জন্য প্র্যাকটিস বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তখন তার বাঁধ-ভাঙা চোখের জল দেখে আমিও তাকে কাছছাড়া করতে পারিনি।"
কানাজাওয়া বলেছেন, তাঁর দুটি ছাত্রও দারুণভাবে তৈরি হচ্ছে। এদের নাম ইয়াহারা ও আশাজিৎ। আগামী দিনে এরা ব্রুস লি-কেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তালিম দিয়েছেন কানাজাওয়া। কলকাতায় এসে ছেলেমেয়েদের ক্যারাটের প্রতি নিষ্ঠা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন।

খেলাধুলো — শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

পা দিয়ে আঘাত করার একটি কৌশল মাওয়াসি গেরি

আমি কিওকুশিন ক্যারাটের পা দিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি। আগে বলেছি, ক্যারাটেতে পা দিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করা এবং আঘাত আটকানোর পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পায়ের ব্যবহার সাধারণত যথেষ্ট জোরালো হয়, ঠিকমতো আঘাত করতে পারলে যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিপক্ষ অনায়াসে কাবু হতে পারে।

আমি যে পা দিয়ে আঘাত করার পদ্ধতি নিয়ে এবার আলোচনা করব তার জাপানি নাম হল 'মাওয়াসি গেরি'।

মাওয়াসি গেরি : 'মাওয়াসি' কথার ইংরেজি অর্থ হল রাউন্ড হাউস এবং গেরি কথার অর্থ কিক। বাংলায় বলা যেতে পারে সামনের প্রতিপক্ষকে পা ঘুরিয়ে মারার পদ্ধতি। পা দিয়ে মারার প্রাথমিক কৌশল বা পদ্ধতিগুলো অনুশীলনের সময় সাধারণত ইওই দাচি থেকে করা হয়। মাওয়াসি গেরি অনুশীলনের জন্য প্রথমে ঠিকভাবে ইওই দাচিতে দাঁড়াতে হবে। এর পর হাতের মুঠো শক্ত করে নীচ থেকে তুলে এনে কানের সমান উচ্চতায় মুখের সামনে হাত দুটো রাখতে হবে প্রতিপক্ষের কোনও আক্রমণ থেকে নিজের মুখকে বাঁচানোর জন্য। এইবার প্রথমে ডান পা হাঁটু থেকে মুড়তে হবে ডানপাশ থেকে এবং পা-টা যতটা পারা যায় তুলে আনতে হবে সেইসঙ্গে শরীরের সব ওজন বাঁ পায়ের ওপর থাকবে। এই অবস্থায় ডান হাঁটু আগে এগিয়ে এবং ডান পায়ের পাতা গোড়ালির অংশ টানটান অবস্থায় পেছনে থাকবে। এইবার ডান পায়ের পাতা টানটান অবস্থায় পেছন থেকে ঘুরিয়ে এনে সামনে কাল্পনিক প্রতিপক্ষের মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়তে হবে। ছোঁড়া হয়ে গেলে আবার ডান পায়ের পাতা ঘুরে পেছনে এসে যাবে, পা হাঁটু থেকে মুড়ে তারপর মাটিতে নেমে আসবে। এইভাবে ডান পা ছোঁড়া হয়ে গেলে একই ভাবে সব ঠিক রেখে বাঁ পা ছুঁড়তে হবে। যখন ডান পা ছোঁড়ার জন্য উঠবে তখন শরীরের ওপরভাগ বাঁ দিকে একটু হেলিয়ে দিতে হবে শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য। ডান হাত মুখের কাছে থাকতে পারে অথবা নেমে আসতে পারে ব্যালান্সের জন্য। বাঁ পা হাঁটু থেকে একটু মুড়তে পারে, বাঁ পায়ের পাতা প্রথম অবস্থায় সোজা থাকবে মাটিতে। যখন ডান পা ঘুরিয়ে নিয়ে ছোঁড়া হবে তখন বাঁ পায়ের পাতা প্রায় ৯০ ডিগ্রি ঘুরে যাবে। ডান পা দিয়ে মারা হয়ে গেলে বাঁ পায়ের পাতা আবার সোজা হয়ে যাবে। এইভাবে সব ঠিক রেখে আবার বাঁ পা দিয়ে অনুশীলন করতে হবে। তারপর আবার ডান পা, আবার বাঁ পা, এইভাবে প্রথম-প্রথম কুড়িবার করে প্রতি পায়ে, তারপর আস্তে-আস্তে বাড়িয়ে পঞ্চাশবার করে অনুশীলন করতে হবে। বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যেন হাঁটুতে ঝটকা না লাগে।

শরীরের ওপরভাগ অল্প হেলে থাকবে। কিন্তু পেছনে হেলে থাকলে চলবে না। সিন্‌বোনের অংশ দিয়ে আঘাত করতে হবে।

ফোটো : উৎপল সরকার

প্রচণ্ড তুষারপাতের জন্য খেলা পরিত্যক্ত হওয়ায় ভাগ্যক্রমে মেলচেস্টার রোভার্স টাইনকাস্টারের হাতে পরাজয় থেকে রেহাই পেয়েছে। এখন সবাই আশা করছে প্রবীণ গোলকিপার টাবি মর্টনকে সরিয়ে রয় সুস্থ-হয়ে-ওঠা চার্লি কার্টারকে গোলে খেলাবে। রয় টাবি মর্টনকে খেলতে নামিয়েছিল আহত চার্লি কার্টারের বদলে।
গোলটা দারুণ বাঁচাল! চার্লি নিজের খেলায় ফিরে এসেছে!
টাবি যদি টাইনকাস্টারে খারাপ না খেলত তবুও চার্লিকে গোলে ফিরিয়ে আনা ছাড়া রয়ের কোনও উপায় নেই!
রোভার্সের রয়
চার্লির চেয়ে বড় গুণগ্রাহী টাবি মর্টনের আর কেউ ছিল না···
টাবিকে সরিয়ে দলে ফিরতে আমার নিজেকে সত্যিই কিছুটা অপরাধী মনে হচ্ছে। দম ফুরিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ও খুবই ভাল খেলেছে···
এবং সবার আগে ও-ই তোমাকে অভিনন্দন জানাবে···
এই, দ্যাখো! রয় আমাদের মাঠে ওয়ালফোর্ডের সঙ্গে খেলায় খেলোয়াড়দের নাম টাঙিয়েছে!
তোমার পক্ষে সুখবর হওয়া উচিত, চার্লি!
না, সুখবর নয়···আমার নাম নেই! টাবিই গোলে খেলছে!
রোভার্স বনাম ওয়ালফোর্ড
টি· মর্টন
এন· ব্যাক্সটার, এস· নেলোর,
এন· গসডেন, ডি· ম্যাককে,
জে· স্প্রেড, আর· রেস, বি· গ্রে,
পি· ডায়াজ, কে· লোগান, জি· রিচি
অতিরিক্ত : সি· নাইট
সে কী?
আর নয়! রয়ের সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করতে যাচ্ছি, এক্ষুনি!
রয়, এইমাত্র খেলোয়াড়দের নাম দেখলাম এবং—!
দুঃখিত চার্লি, এখন নয়। চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলছি। মিনিট কুড়ি পরে এসো, কেমন?
ক্ষিপ্ত খেলোয়াড়টি চলে গেলে···
রয়, মনে হচ্ছে ও আমাদের দল ছেড়ে যেতে চাইছে। ওর দোষ নেই! টাইনকাস্টারের বিরুদ্ধে অমন জঘন্য খেলার পরেও তুমি টাবিকে···
···দলে রাখার জিদ ধরছ কী করে—?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

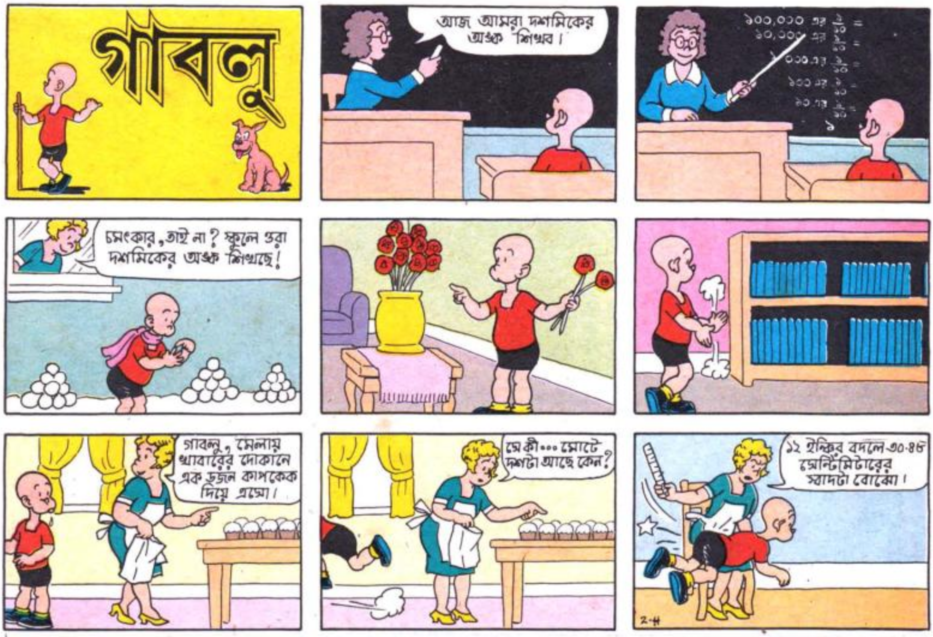

গাবলু
আজ আমরা দশমিকের অঙ্ক শিখব।
১০০,০০০ এর ১/১০ =
১০,০০০ এর ১/১০ =
চমৎকার, তাই না? স্কুলে ওরা দশমিকের অঙ্ক শিখছে!
গাবলু, মেলায় খাবারের দোকানে এক ডজন কাপকেক দিয়ে এসো।
সে কী... মোটে দশটা আছে কেন?
১২ ইঞ্চির বদলে ৩০.৪৮ সেন্টিমিটারের স্বাদটা বোঝো।
2-11

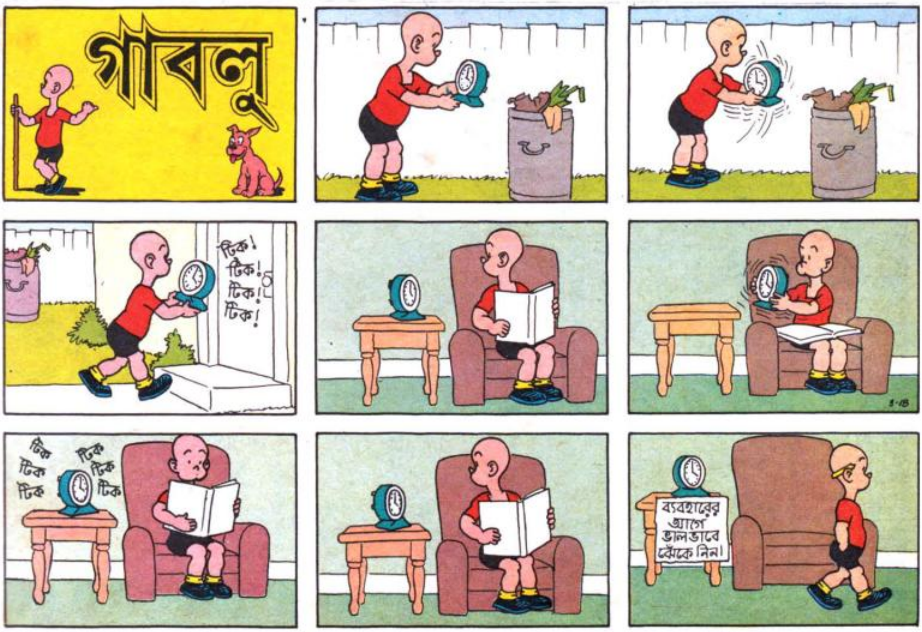

গাবলু
টিক! টিক! টিক! টিক!
টিক টিক টিক
টিক টিক টিক
ব্যবহারের আগে ভালভাবে ঝেঁকে নিন।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধারাবাহিক উপন্যাস

সোনার গনপতি হিরের চোখ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

গুইরাম বলল, "এ-কথা তোমরা আমাকে এতক্ষণ বলোনি কেন ? ও যদি এখানে থাকে, আমার সঙ্গে দেখা হয়, তবে মা-রঙ্কিণীর দিব্যি, ওর জিভটাকে আমি টেনে বের করে নিয়ে আসব। আমার রাগ জানো না তোমরা। শুধু আমি নই, এখানকার অনেক লোকই এখন রেগে আছে ওর ওপর। ওর জন্য এই ঠাকরুনপাহাড়ির বদনাম হয়ে যাচ্ছে। তুমি শের হচ্ছ। হও গে যাও। কিন্তু তোমার দুর্নামের ভাগীদের আমরা হব কেন ?

বিল্টু আর তিন্নি বলল, "আমরা অনেক আশা এবং বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছি। কিছুই চিনি না, জানি না। তবু এসেছি যদি কারও সাহায্য নিয়ে কোনওরকমে মেয়েটাকে উদ্ধার করতে পারি।"

শুভঙ্কর বলল, "শুধু জঙ্গল শের নয়, এখানে আমাদের আর-এক শত্রুও এসে জুটেছে এখন। আমরা তারও দুর্দশা দেখতে চাই।"

গুইরাম বলল, "বুঝেছি। তোমরা নিশ্চয়ই শিকারিবাজের কথা বলছ।"

"হ্যাঁ। ঠিক ধরেছ তুমি।"

"এই দুই শয়তানে এই আরণ্যক পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে। বেশ কিছুদিন ধরেই আমার কানে আসছিল তোমাদের ওই জঙ্গল শের, মানে আমাদের বুনো, লোকের বউ-ছেলে-মেয়ে চুরি করে এনে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখছে। তারপর সুযোগ-সুবিধে মতো বিদেশী লোকদের হাতে বিক্রি করে দিচ্ছে। এখন তোমাদের কথায় সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু শিকারিবাজকে তোমরা চিনলে কী করে ? সে তোমাদের কী করল ?"

ওরা তখন সব কথাই খুলে বলল গুইরামকে। শশিমাস্টারকে হত্যা করা থেকে বিল্টু-তিন্নিকে গুম করার ঘটনা পর্যন্ত সব বলল।' বলল না শুধু সোনার গণপতির কথা।

গুইরাম বলল, "তোমাদের মেয়েটাকে যদি ওরা ধরে এনে এখানেই রেখে থাকে আর তাকে যদি ইতিমধ্যে পাচার না করে থাকে, তা হলে যেভাবেই হোক, আমি তাকে ফিরিয়ে আনব। তবে তোমরা কিন্তু বোকার মতো মারাত্মক একটা ভুল করতে যাচ্ছিলে। এইভাবে ওই জঙ্গলে ঢুকতে গেলে ওর লোকেরা যে তোমাদের চিনে ফেলবে বা ধরে নিয়ে যাবে এটা তোমাদের মাথায় এল না ?"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা জানতাম অঘটন একটা কিছু ঘটতে পারে। তবুও এসেছিলাম ভগবানকে ভরসা করে। তাই তো তোমাকে পেয়ে গেলাম।"

"ভাগ্যে তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল !"

বিল্টু বলল, "কিন্তু আমরা যে সকলের মুখেই শুনলাম দিনমানে এখানে কোনও ভয় নেই ?"

"তা নেই। তবে কিনা সেটা হচ্ছে অন্যের বেলায়। তোমাদের বেলায় নয়। তোমরা তো ওদেরই লক্ষ্য। ওদের শিকার। আর তোমরাই কিনা এইভাবে নিজের থেকে যাচ্ছিলে ওদের হাঁ মুখে ধরা দিতে ? সাহস তো কম নয় তোমাদের !"

"আমরা যে কেন যাচ্ছিলাম সে তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না গুইরামদা। তখন তো ভাবিনি এভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।"

গুইরাম আর কোনও কথা না বলে পাহাড় থেকে নেমে এসে জঙ্গলের দিকে মুখ করে মুখের দু'পাশে হাত রেখে চেঁচিয়ে ডাকল, "পঙ্খী! এই পঙ্খী পঙ্খী রে!"

অমনই বনের ভেতর থেকে ঘন কৃষ্ণবর্ণের একটি ছেলে বেরিয়ে এল।

গুইরাম বলল, "এই, হরিবোলদার কাছ থেকে আমার নাম করে তিনটে সাজ নিয়ে আসবি তো। জংলি সাজ। বলবি, আমি চেয়েছি। খুব দরকার।"

ছেলেটি ছুট্টে চলে গেল।

গুইরাম ওদের একটি বড়সড় গাছের আড়ালে ছায়ায় বসিয়ে বলল, "শোনো, আমার ছেলেটাকে তোমাদের সঙ্গে দিচ্ছি। ওর সঙ্গে সাজ পরে তোমরা ঠাকরুনপাহাড়িতে চলে যাও। ওগুলো পরে যেতে তোমাদের অবশ্য একটু অসুবিধে হবে। মানে খুব গরম করবে। কিন্তু এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। আমার ছেলেটা ওখানকার সব কিছু চেনে-জানে। তোমরা গিয়ে একটু নজরে রেখো ওদের। আমি সবাইকে সতর্ক করে একটু পরেই লোকজন নিয়ে যাচ্ছি।"

বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর দেখা গেল পঙ্খী খালি হাতেই ফিরে আসছে।

গুইরাম বিরক্ত হয়ে বলল, "কী হল?"

"হরিবোলদা বাড়িতে নেই।"

"ধ্যুত, একটা কাজ যদি তোকে দিয়ে হয়।" বলে নিজেই চলে গেল গুইরাম। তারপর হাতে করে কয়েকটি পালকের পোশাক এনে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "এগুলো থেকে একটু বাছাই করে পরে নাও।"

শুভঙ্কর বলল, "এতে তো সবটাই ঢাকা পড়ে যাব আমরা।"

"আমি তো তাই চাইছি। এগুলো আমাদের নাট্য দলের জন্য তৈরি করানো হয়েছিল। শীতকালে মাঝেমধ্যে অবশ্য এগুলো পরে তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েরা শিকারে যায়। তা এগুলো পরে নিলে তোমাদের আসল চেহারা কেউ দেখতে পাবে না। সবাই ভাববে আমাদের এখানকার ছেলেরাই মজা করবার জন্য পরেছে।"

ওরা তা থেকে বেছে একটা ময়ূর, বক ও ভালুকের মুখোশ আঁটা পোশাক পরে নিল।

গুইরাম ওর ছেলেকে কী যেন বলতেই ছেলেটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর ওদের দিকে একটু তাকিয়ে দেখে বনের ভেতর ঢুকে গেল। একটু পরেই তীর-কাঁড় নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল, "চলো।"

গুইরাম বলল, "তোমরা নির্ভয়ে যাও। আমি একটু পরেই যাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি সকলকে। তোমরা নিজেরা কিছু করতে যেও না। একটু ওদের চোখে-চোখে রেখো।"

বিল্টু, তিন্নি আর শুভঙ্কর অদম্য উৎসাহে গণপতিকে স্মরণ করে পঙ্খীর পিছু-পিছু পথ চলতে লাগল। এই পোশাকে এই জংলি দেশে এইভাবে গাছের ছায়ায় পথ চলতে ভালই লাগল খুব। অবশ্য গাছের ছায়া সব জায়গায় যে পেল তা নয়। কেননা সূর্য তো এখন মাথার ওপর। তাই গাছপালার ছায়াগুলো ছোট্ট হয়ে সরল ভাবে পড়ছে। সেই ছায়ায় কোনও ঘনত্ব নেই। তার ওপর কী দারুণ গরম করছে এগুলো পরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘেমে উঠল ওরা। কোথাও

কোনও ফাঁক তো নেই। শুধু শ্বাস নেওয়ার জন্য নাকের কাছে একটা গর্ত। আর দেখার জন্য দু' চোখে দুটো ফাঁক। তবু আশা এই, নিরাপত্তার ভরসা পাওয়া গেছে।

পথ চলতে-চলতেই আলাপ হল গুইরামের ছেলের সঙ্গে। একটু ল্যাকপ্যাকে সহজ সরল। ও এখানকার ছেলের দলের মধ্যমণি। সবাই ওকে ভালবাসে। ওর কথা শোনে। ওর সঙ্গে যেতে-যেতে ওরা ওদের দুঃখের কথা সব বলল। সব শুনে পঙ্খী বলল, "এই কথা? এর জন্য গুইরামের আসা দরকার কি? আমি একাই একশো। আমি তো ওর দরজায় কড়া নাড়ব না। আগে একটা তীর ছুঁড়ব। তারপর ও বেরিয়ে এলেই বলব, "শিগগির মেয়েটাকে বার কর। না হলে তোর কলজেটাকে ফুটো করে দিলুম বলে।"

তিন্নি বলল, "তুমি তোমার বাবার নাম ধরছ পঙ্খী?"

"তাতে কী হয়েছে। আমরা অমন বলি। তবে নাম ধরে ডাকি না অবশ্য।"

শুভঙ্কর বলল, "কিন্তু তুমি যে এইরকম করবে তাতে যদি ও রেগে গিয়ে গুলি চালায়?"

"চালাক না। তারপর? তারপর ওর আর কিছু নেওয়ার থাকবে?"

বিল্টু বলল, "এই জঙ্গল শেরের নামে কত কথাই না শুনেছি। এই অঞ্চলের আতঙ্ক ও।"

"আসলে বাইরের লোকেরা ওদের আচমকা উপদ্রবকে ভয় খায়। কিন্তু এখানে তো আমরা ওর সব কিছু জানি। আমরা ভয় পাব কেন?"

বিল্টু বলল, "তুমি যে আগেই ওকে চার্জ করবে এতে তোমার বাবা রাগ করবেন না?"

"আরে আমি তো গুইরামেরই ব্যাটা। চলোই না আগে গিয়ে দেখি কে কোথায় কীভাবে আছে। তবে এটুকু বলছি, এ-কাজটা আমার দ্বারাই সম্ভব।"

ওরা আর কোনও কথা না বলে ধীরে-ধীরে চলতে লাগল। যাত্রাপথে দু' চোখ মেলে প্রকৃতির নব-নব রূপ দেখতে লাগল ওরা। গভীর অরণ্যানীর শ্যামলিমায় ওদের চোখ দুটো ভরে উঠল।

অপূর্ব সবুজ শোভা! কত গাছের সমারোহ। এখানে তার কোনও নাম জানা নেই। এখানে শুধু যে অরণ্য তা তো নয়, সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে সমান্তরাল শৈলমালা বাসুকী নাগের ফণার মতো মাথা উঁচিয়ে আছে। পথে যেতে-যেতে পক্ষীই কিছু-কিছু গাছপালার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ওদের। শাল, সেগুন, মহুয়া ওদের চেনা। ঘন পত্রের চিহড় লতাও অপরিচিত নয়। অবশ্য শুভঙ্করের কাছে নতুন। পক্ষী বলে, "ওই হচ্ছে শাল, শিমুল। ওদিকে পিয়াল। আর ওই যে গাছটা দেখছ ওটা হরিতকীর। এপাশে শিরীষ, মহুয়া, কুসুম। এদিকে দ্যাখো মেহগনি গাছ। শিশু গাছ। অর্জুন, পলাশ। সেই সঙ্গে অজস্র বুনো জামের গাছও আছে।"

তিন্নি বলল, "আর ও-ধারের গাছগুলো তো আকাশমণি।"

"ওর পাশেই সারি-সারি ইউক্যালিপটাস।"

ওরা একটা মালভূমির মতো অংশে বাঁক নিয়ে ক্রমশ পাহাড়ে ওঠা শুরু করল। এই পাহাড়ের উঁচু অংশের জঙ্গল এত ঘন যে, এর নীচে সূর্যালোকও প্রবেশ করে কিনা সন্দেহ। এখানে পাহাড়ের কোলে ছোট-ছোট আদিবাসী গ্রাম। সেখানে আদিবাসী ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। বুনো জাম কুড়োচ্ছে। কেউ-বা গাছপালার শুকনো ডাল ভেঙে জড়ো করছে। কেউ-কেউ, মানে ওদের চেয়ে একটু বড় যারা, তারা ছোট-ছোট শাল গাছের গায়ে কোপ মেরে গাছ কেটে জ্বালানির কাঠ সংগ্রহ করছে। এইভাবে ওরা অনেকটা পথ যাওয়ার পর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতেই একটি হ্রদের সামনে এসে পড়ল। দু'পাশের খাঁজ-কাটা পাথরের বুক চিরে হ্রদের আকারে বয়ে চলেছে একটি নদী।

পক্ষী বলল, "আমরা ঠাকরুনপাহাড়িতে এসে গেলাম।"

ওরা ভাল করে তাকিয়ে দেখল, শুধু পাহাড় আর পাহাড়। তারই মাঝখানে ছোট-ছোট কয়েকটি পর্ণকুটির।

শুভঙ্কর বলল, "এখানে কী এই একটাই গ্রাম?"

পক্ষী বলল, "একটা কী গো। অনেক গ্রাম আছে এখানে। সবই পাহাড়ি গ্রাম। পাহাড় আর জঙ্গল ছাড়া এখানে তো কিছু নেই। ওই হচ্ছে কুটুচুয়া, ওদিকে ধাঙ্গিচুয়া, ওঁদলচুয়া, ওপাশে মাঝগেড়ে। আর এই দিকে হচ্ছে চিরুগোড়া, চিয়াকুঠি, বাঁশপাহাড়ি, বীরমাদল, পূর্ণপানি, ঢাঙ্গিকুসুম। ঢাঙ্গিকুসুম হচ্ছে বিহার-বাংলার বর্ডার। ওদিকে জামাইমারি, জাঁতালবেড়া। আর ওই যে পাহাড়টা দেখছ, ওটা হচ্ছে মাঝ কাঁদনা। ওপাশের পাহাড়টা চেনো?"

সবাই বলল, "না।"

"তোমরা যেদিক থেকে এলে, ওই পাহাড়টা হচ্ছে সেই বেলপাহাড়ির খুব কাছে। ওর নাম কানাইশোর। আষাঢ় মাসের তৃতীয় শনিবার পাহাড়-পুজো হয় ওখানে। বিরাট মেলা বসে। আর ওই হচ্ছে চিটিপাথর, ওদিকে লবণী। ওখানে হলদে মাটি পাওয়া যায়। আর এইপাশে কুটুচুয়া। সাদা মাটির খনি। আর ওই যে দেখছ? ওই হচ্ছে কুঁড়োলপাহাড়ি।"

পক্ষী তো এক নিশ্বাসে বলে গেল সব। কিন্তু যাদের বলল, তাদের সবই গুলিয়ে গেল। বাপ রে! এত কখনও মনে থাকে? তাই ওরা কতক শুনল, কতক অন্যমনস্কতার জন্য শুনেও শুনতে পেল না। ওদের একমাত্র লক্ষ্য এখন জঙ্গল শের এবং মউকে উদ্ধার করা। আর সত্যি কথা বলতে কি, ঠাকরুনপাহাড়ির গ্রামে পা দেওয়া মাত্রই ওদের বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেছে। কীভাবে যে কী করবে, কী করে মউকে উদ্ধার করবে কিছুই ভেবে পেল না। এই ছদ্মবেশে ওরা অনেকটা নিরাপত্তা পেয়েছে। কিন্তু ওদের নিজেদের নিরাপত্তাটাই তো বড় নয়। ওরা সেই হ্রদের কাছে একবার একটু থমকে দাঁড়াল। এই ঠাকরুনপাহাড়িরই ছোট একটি পাহাড় থেকে দুরন্ত ডুলুং প্রথমে ঝরনার আকারে এবং পরে হ্রদের মতো হয়ে দুর্বার গতিতে খরস্রোতে বয়ে চলেছে। ওরা একটি ছোট্ট সাঁকোয় নদী পার হয়ে ছোট্ট একটি মাটির ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের দরজায় তালা দেওয়া।

পক্ষী বলল, "কই, কোথায় তোমাদের জঙ্গল শের!"

বিল্টু, তিন্নি ও শুভঙ্করের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

গেল কোথায় তবে লোকটা? মউকে নিয়ে কোথায় পালাল?

পক্ষী বলল, "ঘাবড়াবার কিছুই নেই। হয়তো ও পাহাড়ের গোপন ঘাঁটিতে গেছে।"

ওরা তখন সেখান থেকে এগিয়ে আরও একটু উচ্চস্থানে আর-একটি খোড়ো ঘরের দাওয়ায় উঠল। এটি এই ঠাকরুনপাহাড়ির একমাত্র দোকান। এখানে চা, তেলেভাজা, মুদিখানা সব কিছুই আছে। এমনকী মোটা ধুতি-শাড়িও পাওয়া যায়।

পক্ষী দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "বুনোর ঘরে তালা কেন বাসুদা?"

"কে জানে। আজ এক সপ্তাহ তো দেখছি না ওকে। কেন, কী ব্যাপার বলো তো?"

"দরকার ছিল একটু।"

দোকানের একপাশে কয়েকটি অদ্ভুত রকমের ফল জড়ো করা ছিল। শুভঙ্কর সেগুলোর দিকে তাকিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "এগুলো কী জিনিস?"

"ও হল কড়চা। এর বীজ থেকে তেল হয়। মহুল থেকেই এই কড়চা জন্মায়। কড়চার তেল কুড়ি বছরের পুরনো হলে বাত ও চিতি সাপে কামড়ালে সেরে যায়।"

বিল্টু, তিন্নি বলল, "বলো কী!" (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

টাকাকড়ি

মৌর্যোত্তর যুগ : দক্ষিণ ভারতের মুদ্রা

মৌর্য-পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে সরকারি বা বেসরকারিভাবে ছোট-ছোট ছাঁচ-চিহ্নিত মুদ্রা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। লিখেছেন **ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**

অমরাবতীতে একটি মাটির হাঁড়িতে পাওয়া গিয়েছিল ৭৬৬৮টি রুপার মুদ্রা। যেগুলির মুখ্য দিকে সাধারণত পাঁচটি ছাপ দেখা যায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি প্রাচীন বসতি বা ধর্মীয় স্থানে (যেমন অমরাবতী, বড্ডমানু, প্রভৃতি) উৎখননের সময় মৌর্য যুগের স্তরে অর্থাৎ ওই আমলের ধ্বংসাবশেষে কোনও পাঁচ ছাপ বিশিষ্ট রুপার মুদ্রা পাওয়া যায়নি। এই তথ্যের ভিত্তিতে সম্প্রতি অনুমান করা হয়েছে যে, দক্ষিণ ভারতে ক্ষুদ্র ছাঁচ বা পাটা চিহ্নিত মুদ্রার প্রচলন মৌর্য যুগে ছিল না। কিন্তু মাত্র কয়েকটি স্থানে (বিশেষত ধর্মীয় স্থানে) উৎখননের ভিত্তিতে এইরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়, বিশেষত যখন অন্য দুই-একটি উৎখননে (যেমন কুর্নুল জেলার বীরপুরমে) মৌর্য আমলের ধ্বংসাবশেষে আলোচ্য শ্রেণীর মুদ্রার (কার্ষাপণের) নিদর্শন পাওয়া গেছে। আরও মনে রাখতে হবে যে, অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী রাজকর্মচারীদের বেতন এবং নানা ধরনের অপরাধের দণ্ডের মূল্য পণ (অর্থাৎ কার্ষাপণ) মুদ্রার মাধ্যমে দেওয়া হত। এই তথ্য মৌর্য যুগে প্রযোজ্য হলে ওই সময় দক্ষিণ ভারতের মৌর্য শাসিত ভূখণ্ডে আলোচ্য শ্রেণীর মুদ্রা নিশ্চয় প্রচলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে চারটি ছাপ বিশিষ্ট যে শ্রেণীর রুপার মুদ্রা প্রাক-মৌর্য আমলে প্রচলিত হয়েছিল (যার অন্তত একটি নিদর্শন বীরপুরমে পাওয়া গেছে) তারই স্বাভাবিক পরিণতি ছিল পাঁচ ছাপ বিশিষ্ট মুদ্রার প্রবর্তনে। আলোচ্য মুদ্রাগুলির বেশিরভাগই তৈরি হয়েছিল মুদ্রাযোগ্য ধাতবখণ্ডের ওপর একের পর এক ছোট-ছোট ছবির পাটা দিয়ে আঘাত করে। কিন্তু কিছু মুদ্রাকে দেখলে মনে

'সদ' বংশের একটি মুদ্রার একদিকের রেখাচিত্র

বেসরকারিভাবে ছোট-ছোট ছাঁচ চিহ্নিত মুদ্রা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এই সময়ে প্রস্তুত মুদ্রাগুলি হয় পুরনো রীতিতে মুদ্রাযোগ্য ধাতব খণ্ডের ওপরে বিভিন্ন ছাপ মেরে তৈরি হত অথবা বিভিন্ন ছোট ছবির নঞর্থক রূপ উৎকীর্ণ ছাঁচ গলানো ধাতু ঢেলে তৈরি করা হত।

হয় যে, ওগুলির পাত তৈরি হয়েছিল গলানো ধাতু ঢেলে দেওয়ার ফলে প্রস্তুত পিণ্ডকে পিটিয়ে সোজা করে। আলোচ্য শ্রেণীর রুপার মুদ্রাগুলিতে অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত তামার খাদ লক্ষ করা যায়। কিন্তু এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। অর্থশাস্ত্রে রাজকীয় টাঁকশাল তৈরি ১৬ মাষ (বা ৩২ রতির) রুপার মুদ্রায় ৫ মাষ তামা ও খাদ যোগ করার কথা লেখা হয়েছে। এই জাতীয় মুদ্রার প্রকৃত মূল্য বাজারে প্রচলিত আপাতমূল্য থেকে কম হলেও লোকে সেগুলিকে তাদের কেনাবেচার কাজে ব্যবহার করত, কারণ ওইগুলি যে সরকার তৈরি করেছিল তার প্রতি তাদের আস্থা ছিল।

উত্তর ও দক্ষিণের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য ভারতীয় মুদ্রায় এক সর্বভারতীয় চরিত্র দিয়েছিল। সেই সূত্রে দক্ষিণ ভারতও এই সর্বভারতীয় ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল।

বিভিন্ন ছোট-ছোট ছবির ছাঁচ বা পাটা চিহ্নিত মুদ্রার ব্যবহার মৌর্য যুগের সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়নি। কয়েকটি জায়গায় উৎখননের সময় মৌর্য যুগের অনেক পরবর্তীকালের ধ্বংসাবশেষে এই জাতীয় মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেছে। গুন্টুর জেলার বড্ডমানুতে তো ইক্ষবাকু (খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী), এমনকী বিষ্ণুকুণ্ডিন (খ্রিস্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর প্রথমভাগ) আমলের ধ্বংসাবশেষেও এগুলির নিদর্শন মিলেছে। এ ছাড়া কিছু মুদ্রা-ভাণ্ডারে মৌর্যোত্তর যুগের মুদ্রার সঙ্গে আলোচ্য শ্রেণীর মুদ্রাও পাওয়া গেছে। এই প্রসঙ্গে কেরলের ত্রিচুর অঞ্চলের এ্যয়লে আবিষ্কৃত এক পাত্রের উল্লেখ করা যায়। এখানে আমাদের বিবেচ্য ৩৪টি রুপার মুদ্রার সঙ্গে পাওয়া গেছে খ্রিস্টপূর্ব ও খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের কিছু রেসেক মুদ্রা।

এইসব তথ্য থেকে মনে হয় যে, মৌর্যোত্তর কয়েক শতাব্দী ধরে সরকারি বা বেসরকারিভাবে ছোট-ছোট ছাঁচ চিহ্নিত মুদ্রা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এই সময়ে প্রস্তুত মুদ্রাগুলি হয় পুরনো রীতিতে মুদ্রাযোগ্য ধাতব খণ্ডের ওপরে বিভিন্ন ছাপ মেরে তৈরি হত অথবা বিভিন্ন

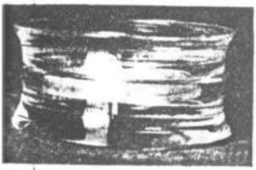

পাশের নকশাটি থাকত এ-ধরনের স্ফটিক পাত্রের নীচে

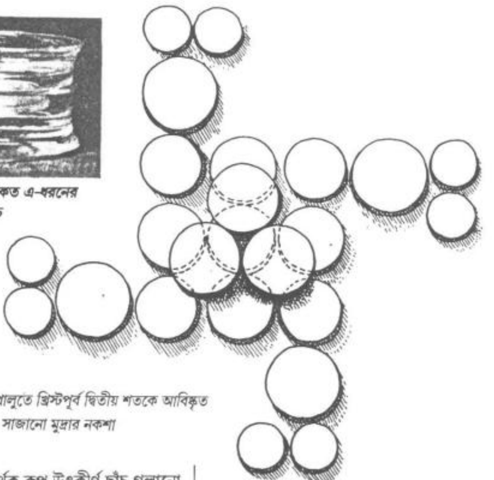

অন্ধ্রপ্রদেশের ভট্টিপ্রোলুতে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে আবিষ্কৃত স্বস্তিকের অনুকরণে সাজানো মুদ্রার নকশা

ছোট ছবির নঞর্থক রূপ উৎকীর্ণ ছাঁচ গলানো ধাতু ঢেলে তৈরি করা হত। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুদ্রাগুলি প্রকৃতপক্ষে ছাঁচে ঢালা মুদ্রা। কোণ্ডাপুরে এই জাতীয় ছাঁচ ও মুদ্রার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

মৌর্যোত্তর যুগে তৈরি বিভিন্ন ছোট-ছোট ছাঁচ বা পাটা চিহ্নিত মুদ্রায় যেসব ছাপ দেখা যায়, সেগুলির মধ্যে কখনও-কখনও নতুন প্রতীকের সন্ধানও পাওয়া যেতে পারে। ১৬ থেকে ৩০ গ্রেনের অর্থাৎ বোধ হয় অর্ধেক কার্ষাপণ মূল্যের এক শ্রেণীর রুপার মুদ্রার মুখ্য দিকে যে পাঁচটি ছাপ দেখা যায় তাদের মধ্যে পূর্বপরিচিত সূর্যের প্রতীক, গাছ ও আরও একটি পুরাতন চিহ্ন ছাড়াও স্তূপ এবং পরশু ও ত্রিশূল সমন্বিত এক অস্ত্রের ছবি দেখা যায়। শেষের দুটি মৌর্যযুগের দক্ষিণ ভারতের মুদ্রায় দেখা যায় না। সুতরাং মৌর্যোত্তর যুগে সরকারি বা বেসরকারিভাবে মুদ্রা তৈরির সময় পুরনোর সঙ্গে নতুন-নতুন ছবিও ব্যবহার করা হয়েছিল।

এই মুদ্রাগুলির গৌণ দিকে একটি মাছের ছবি উৎকীর্ণ দেখা যায়। সুদূর দক্ষিণে পাণ্ড্য রাজ্যের রাজকীয় চিহ্ন ছিল মাছ। তাই আলোচ্য মুদ্রাগুলিকে পাণ্ড্য রাজ্যের রৌপ্য মুদ্রা বলে মনে করা যেতে পারে।

মৌর্য সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমানার বাইরে এখনকার কেরল ও তামিলনাড়ু অঞ্চলে এবং বোধ হয় কর্নাটকের চিত্রদুর্গ জেলার দক্ষিণে যে চারটি রাজ্য ছিল বেচাল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র ও কেতলপুত্র বা কেরলপুত্র— তাদের মধ্যে পাণ্ড্য অন্যতম। এই রাজ্যে মৌর্য বা খুব সম্ভবত মৌর্যোত্তর যুগে যে ধরনের তামার মুদ্রা চালু ছিল তার মুখ্য দিকে একটি প্রদীপ (বা ধ্বজা ?) এবং পাণ্ড্যদের রাজকীয় চিহ্ন মাছের ছবি দেখা যায়। তামিলনাড়ু র কাবেরীপত্তিনম অঞ্চলে কিছু চৌকো তামার মুদ্রা পাওয়া গেছে যেগুলির মুখ্য দিকে সূর্যের প্রতীক এবং লেজ উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা বাঘের ছবি ; আর অন্যদিকে দেখা যায় মাছ, হাতি ও অন্যান্য চিহ্ন। সঙ্গম সাহিত্যে চোলদের রাজকীয় চিহ্ন হিসাবে বাঘের উল্লেখ আছে। সুতরাং কোনও-কোনও পণ্ডিত ওই মুদ্রাগুলি প্রাচীন চোল রাজ্যের মুদ্রা বলে মনে করেন। আরোহীসমেত বা আরোহীবিহীন হাতির ছবি দেখা যায় এক শ্রেণীর তামার মুদ্রার মুখ্য দিকে, যে-দিকে নানারকম মাঙ্গলিক চিহ্ন থাকলেও প্রধান ছবিটি হচ্ছে হাতির। অন্যদিকে ধনুকাকৃতি খিলানের নীচে একটি ত্রিকোণ চিহ্ন। চের-রাজারা অনেক হাতির মালিক ছিলেন বলে আলোচ্য মুদ্রাগুলিকে প্রাচীন চের-রাজ্যের মুদ্রা বলে কেউ-কেউ অনুমান করেন।

মৌর্যোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছবিসমেত লেখবিহীন তামার মুদ্রার বহুল প্রচলন হয়েছিল, বিশেষত অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, নর্মদার দক্ষিণবর্তী মধ্যপ্রদেশে ও উত্তর কর্নাটকে। সঙ্গে-সঙ্গে মুদ্রা তৈরির জন্য সিসা ও পোটিনের (তামা, দস্তা, সিসা ও টিনের মিশ্রণে তৈরি এক সংকর ধাতুর) ব্যবহার শুরু হয়। ওইসব মুদ্রার কিছু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ছাঁচ বা পাটা চিহ্নিত ধাতব খণ্ডে আঘাত করে তৈরি। অন্যদিকে বেশ কিছু মুদ্রা দেখলে মনে হয় যে, এগুলির মুখ্য বা গৌণ দিকের ছবিগুলির জন্য একটি করে ছাঁচ বা পাটা ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি মোটামুটি ভাবে এক উন্নত শ্রেণীর পাটা চিহ্নিত মুদ্রা। অবশ্য বেশিরভাগ মুদ্রাই ছাঁচে গলানো ধাতু ঢেলে তৈরি।

মৌর্যোত্তর দক্ষিণ ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থার আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে মুদ্রায় লেখর আবির্ভাব। ছবি ও লেখসমেত মুদ্রাগুলি পাওয়া গেছে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং চাষ ইত্যাদির জন্য মাটি খোঁড়ার সময়, অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের বিভিন্ন স্তরে। এদের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের করিমনগর জেলার কোটলিঙ্গলে প্রাপ্ত গোভদ্র (তীরসমেত ধনুক, গাছ, তিনটি ঢিবি, ইত্যাদি : চিহ্নবিহীন গৌণ দিক), সমিগোপ (তীর সমেত ধনুক ও অন্যান্য চিহ্ন : ত্রিরত্ন ; গাছ : ত্রিরত্ন ; গাছ ও বলদ : ত্রিরত্ন), নরণ (সিংহ ইত্যাদি : তিনটি ঢিবি, গাছ, ইত্যাদি) কংবয় (তীর সমেত ধনু ইত্যাদি : নন্দীপদ) প্রভৃতির নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের বড্ডমানুতে-(র) (ঞ) সেবকস লেখযুক্ত যে মুদ্রা পাওয়া গেছে সেটির মুখ্য দিকেও বলদ ও গাছ এবং গৌণ দিকে ত্রিরত্ন। ওই জায়গায় উৎখননের সময় এবং আরও কয়েকটি অঞ্চল থেকে মুখ্য দিকে সাধারণত সিংহের ছবি ও লেখসমেত যেসব মুদ্রা পাওয়া গেছে সেগুলি থেকে মহাসদ, সিবমকসদ, তাসকসদ ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়।

উৎখননের সময় যেসব আমলের মুদ্রা পাওয়া গেছে, তাদের তারিখ অনুযায়ী সেগুলি মৌর্যোত্তর ও প্রাক্-সাতবাহন যুগের, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দীর। মুদ্রাগুলি তামা ও সিসার। অনেকগুলি পোটিনের ; আবার কয়েকটি কাঁসার। এদের আকার বিভিন্ন ধরনের (গোল, উপবৃত্ত, চৌকো, ইত্যাদি)। ওজনের দিক থেকেও বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে তারতম্য আছে। তবে এদের সকলের সাক্ষ্য অন্ধ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট সময়ে স্থানীয় শাসকদের নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলনের ইঙ্গিত করে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গোভদ্রর নামের সঙ্গে মিল আছে এমন চারজন শাসকের (দমভদ্র, ধর্মভদ্র, সর্বভদ্র ও সত্যভদ্র) মুদ্রা পাওয়া গেছে মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলে। (ক্রমশ)

সম্পূর্ণ উপন্যাস

চাঁদের মাঠে ওয়ানডে

সিদ্ধার্থ ঘোষ

"হ্যালো ! আবির ? আমি দিব্য বলছি !"

সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া দিতে পারল না আবির ।

"শুনছিস ? কাল সুপারটাউনের সঙ্গে ম্যাচ । ঠিক এগারোটায়…"

"সরি । কাল আমার মর্নিং ডিউটি—দুটোয় ছুটি !"

"শোন আবির !" গলাটা নামিয়ে দিব্য যেন খুব গোপনীয় খবর ফাঁস করার ভঙ্গিতে বলল, "কালকের ম্যাচটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ । সব কথা এখন বলা সম্ভব নয় । কিন্তু কাল যদি না খেলিস খুব ভুল করবি ।"

এই সিজনে একদিনও নেটে যায়নি আবির । চাকরিতে ঢোকার পর থেকে প্র্যাকটিস ছাড়তে বাধ্য হয়েছে । দুটো ম্যাচে কোনও রানও পায়নি । আগের ম্যাচে তাকে বসিয়ে দিয়েছিল এই দিব্যই । তবু মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারে না যে, টুয়েলভ্‌থ ম্যান হয়ে টিমের সেবা করার কোনও ইচ্ছে বা সুযোগও নেই ।

আবিরের মনের কথাটা বুঝে নিয়েই যেন দিব্য যোগ করল, "কাল আমি নামছি না, তাই তোকে খেলতেই হচ্ছে ! সি ইউ…"

"কে ফোন করছিল ?" বাবার গলা শুনে পেছনে ফিরল ।

"দিব্য ।"

"হুঁ ! একটা কথা মনে রেখো, নতুন চাকরি, গাফিলতির জন্য চাকরি যদি যায়, সেঞ্চুরি হাঁকড়ালেও ফিরে পাবে না ।"

আবিরের বাবার নাম সুন্দরলাল না হলে এই উপদেশ আর ব্যাখ্যা করার কোনও প্রয়োজন থাকত না। সংসারের টানাটানির জন্য কলেজ ছেড়ে চাকরিতে ঢোকার পর বাবার কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বড় ম্যাচে আর নামবে না। কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রতিজ্ঞা তো স্বয়ং সুন্দরলালই করিয়েছিলেন, "ব্যাট অবধি ছোঁবে না।"

এশিয়ান ইলেভেনের ওপেনার সুন্দরলাল প্রথম সুপারটেস্টে সাতাশি নট আউট। দ্বিতীয় টেস্টের সেকেন্ড ইনিংসে একশো উনসত্তর— রিটায়ার্ড হার্ট। আচমকা গুড লেংথ স্পট থেকে বলটা লাফিয়ে উঠেছিল। মুখ সরিয়ে নিয়েও বাঁ চোখটাকে বাঁচানো যায়নি। এর দু' বছর বাদে প্রতিজ্ঞাটা করেছিলেন সুন্দরলাল। কারণ খুব সরল। প্রথমত, লড়াইয়ের ময়দান থেকে বিদায় নেওয়ার পর বীরের কথা মাস তিনেকের বেশি মানুষের মনে থাকে না। দ্বিতীয়ত, প্রাক্তন স্টার ব্যাটসম্যানও এক চোখ কানা হলে টিভি কমার্শিয়ালে ঠাঁই পান না। পয়সা তো ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড দেন না, দেন বিজ্ঞাপনদাতারা। যাই হোক, প্রতিজ্ঞা কিন্তু ভাঙতে হয়েছিল। প্রশিক্ষকের চাকরি না নিয়ে পথ ছিল না।

॥ ২ ॥

মাঠে যাবে না ঠিক করেই ডিউটিতে যথাসময়ে হাজির হয়েছিল। কিন্তু পনেরো মিনিটের মধ্যেই কারখানার ফোরম্যান মজুমদার যখন কাজটা বুঝিয়ে দিলেন, আবিরের গলার কাছে একটা কান্না যেন দলা পাকিয়ে উঠল। জরুরি কাজ। আট ঘণ্টা খেটেও এটাকে শেষ করা চাট্টিখানি কথা নয়। ঘণ্টা তিনেক আগে ছুটি চাওয়ার আর কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

মাইল্ড স্টিলের টুকরোগুলোকে শত্রুর মতো ঠেকছে আবিরের। ঠিক সাড়ে ছ'টা থেকে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ শুরু করেছে। পাগলের মতো খেটে চলেছে। আটটায় চায়ের সময়েও ফ্লোর ছেড়ে নড়েনি।

কাঁধের ওপর একটা হাত পড়তে চমকে ফিরে তাকাল। মনোজদা।

"ব্যাপার কী রে আবির?" মনোজ ওয়েল্ডিং বিভাগের হেড মিস্ত্রি। আর ছ' মাস বাদে রিটায়ার করবেন।

উত্তর দেয় না আবির। ইলেকট্রোডের ডগা থেকে ফুলকি ছোটায়।

"কী রে! হলটা কী, খেলা আছে নিশ্চয়?"

প্রায় জোর করেই ঠেলে তুলে দেন আবিরকে। মনোজ তাঁর নিজের কাজে পাঠাচ্ছেন আবিরকে। এঁর ওপর কারও কোনও কথা বলার নেই। সব দায়িত্ব তাঁর।

ট্যাক্সি ধরার সময়েই আবিরের মনে হয়েছিল, কোনও লাভ নেই। ফালতু খরচ। সময়মতো পৌঁছনো সম্ভব নয়।

হলও তাই। ঘড়ির দিকে অসংখ্যবার তাকানোর পরেও সোয়া এগারোটা বেজে গেল। তেইশটা টাকা জলে। তবু যেন চুম্বকের আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে গেল।

প্যাভিলিয়নের গেটের মুখেই দিব্য। বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুধু চড়টা কষাতেই বাকি, "তুই দেখছি আমাকে না ডুবিয়ে ছাড়বি না! টসে না জিতলে আমাদের এখন দশজনের সাইড নিয়ে ফিল্ডিংয়ে নামতে হত!"

ধন্যবাদের একটা শব্দ পর্যন্ত বেরোল না আবিরের মুখ থেকে। তার মনে শুধু একটাই প্রশ্ন, আজকের ম্যাচটা এমন কী গুরুত্বপূর্ণ! দিব্য তাকে সব সময়েই ব্যাক করে, কিন্তু এতটা...

দিব্য ধমক দিল, "হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে থাকলে হবে? মাহফুজ তিন ওভারে দু'জনকে খসিয়েছে। গেট রেডি!"

থ্রি ডাউনের জায়গায় ফোর ডাউনে নামার অনুরোধ মঞ্জুর হল। কিন্তু তাতেও বিশেষ কোনও সুবিধে হয়নি আবিরের। পোশাক বদল করে প্যাভিলিয়নে বসে দুটো ওভার পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছে। ন' ওভারে পনেরো রান, তিন উইকেট। মেট্রোপলিসের সব ক'টা উইকেটই মাহফুজের পকেটে।

শব্দসন্ধান রঞ্জন

১	২	৩		৪			৫		৬
৭									
			৮			৯		১০	
১১		১২		১৩				১৪	
		১৫	১৬						
	১৭					১৮	১৯		
২০			২১		২২		২৩		২৪
২৫		২৬			২৭				
							২৮	২৯	
৩০				৩১					

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) প্রতি দশ বছর অন্তর দেশে হয় এটা। (৫) 'তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই'—রবীন্দ্রনাথ কাকে দিয়ে বলিয়েছেন এ-কথা ? (৭) শক্ত নয়। (৮) মিথ্যাটা এই বিশেষণেই জোরালো হয়। (৯) হার। (১১) দুমুখো অস্ত্র। (১৩) দুগ্ধজাত খানদানি খাবার। (১৪) গোয়েন্দা। (১৫) ধারাবাহিকতা, পরম্পরা। (১৮) এই ফল কাপড় কাচে। (২০) গুড়বিশেষ। (২১) প্রাণহীন। (২৩) নড়লে হুঁশ হয়। (২৫) যানবাহন। (২৭) 'চিতাবাঘের — ঠ্যাং।' (২৮) হে বিদেশী ফুল, গন্ধে আকুল করো তুমি। (৩০) প্রতারক। (৩১) খেলায় তো থাকবেই, না-থাকলে দু' পক্ষই সমান-সমান।

উপর-নীচ : (১) 'মা বলিতে প্রাণ করে —'। (২) অনেক দোকানে লেখা থাকে, 'এক —'। (৩) আমার। (৪) প্রতিমাসে প্রদেয় ভাতা বা বৃত্তি। (৫) উপস্থিতি। (৬) নীলপদ্ম। (৯) প্রাণের দায়ে মানুষ এমন করে দৌড়য়। (১০) জ্যোতির্বিদ্যায় আকাশের দ্বাদশ রাশি। (১২) কুমির। (১৬) কাল্পনিক, অলীক। (১৭) অনেকের মুখ থেকে যে-বাজি ছোটে। (১৯) বাইরের চালচলন, মানসম্ভ্রম। (২০) ক্রুদ্ধ। (২২) সুদিন। (২৪) কয়েকটি। (২৬) বেতারে দূরদর্শনে সভায় অনুষ্ঠানে ইনি থাকবেনই। (২৮) রবীন্দ্রনাথের লেখা উপন্যাস। (২৯) খই।

গত সংখ্যার সমাধান

অ	মা	ন	ব			অ	নু	প্রা	স
তি	নি		কা	ম	ধে	নু			হ
	ক		ব	ই		শা	জা	হা	ন
	জো	না	কি		মা	স			শী
খ	ড়	ম			ঘ	ন	ক		ল
ব		তা	মা	ম			ম	ম	তা
রা			না	গ		পা	ঠ	ক	
খ	র	শা	ন		শি	শু		র	
ব			স	ং	লা	প		ধ্ব	জা
র	ই	র	ই			ত	র	জ	মা

নতুন বলের সাইন এখনও তেমন নষ্ট হয়নি যে, মাহফুজের প্যান্টটা অত রক্তাক্ত দেখাবে। পুরনো প্যান্ট পরে নেমেছে সে। পয়া প্যান্ট। গত সিজনে ওয়ার্ল্ড কাপের সেমিফাইনালে কি এটা পরেই সে নেমেছিল ? সতেরো রানে সাতটাকে খুন করার ক্ষমতাটাকে আবার ফিরে পেতে চায়?

ক্রিকেট মাঠের সঙ্গে চার পুরুষের সম্পর্কের কথা মনে করার চেষ্টা করে আবির। তবু এই মুহূর্তে সেটা তার টেনশন লাঘব করতে খুব একটা কাজে লাগে না। জাফরি একটা লেট আউট সুইঙ্গারে ক্লিন বোল্ড। মাঠে নামার সময়ে সিঁড়ির ধারে কী একটা অদ্ভুত আকর্ষণে মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

বাবা ! রংচটা বিবর্ণ ব্লেজার গায়ে একটা মানুষ। ব্লেজারটা একজন সেঞ্চুরি মেকারের, এশিয়ান টিমের খেলোয়াড়ের। রাজার পোশাক। কিন্তু মজাটা হচ্ছে রাজত্ব থাকলে তবেই রাজার পোশাক মানায়। শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য সেটা ব্যবহার করলে দুর্দশা যেন আরও অসহনীয় লাগে।

মিড্‌ল ও লেগ স্টাম্পের গার্ড নিল আবির। তার দু' পায়ের মাঝে প্রায় দেড় ফুটের ব্যবধান। ঠিক ব্যাকরণসম্মত নয়। দেখলেই মারকুটে দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটসম্যানের ছবি মনে আসে। পপিং ক্রিজ ছেড়ে লাফ মারার জন্য যেন তর সইছে না। তার ছ' ফুট তিন ইঞ্চি উচ্চতাকে একটু দমন করার জন্যই যেন কেরিয়ারের প্রথম থেকেই সে এই ভঙ্গিতে খেলে যাচ্ছে। ট্রেনারদের আপত্তি সত্ত্বেও তার স্বাভাবিক খেলা বদলায়নি।

গুড লেংথের সামান্য খাটো বলটা মিড্‌ল স্টাম্পের লাইনে পিচ খেয়ে আউট সুইং করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। শাফ্‌ল করে ব্যাকফুটে চলে এসে বলটাকে ছেড়ে দেওয়াই ছিল নিরাপদ। কিন্তু আবির গ্লান্স করল।

বিপক্ষের প্রায় হাজার পাঁচেক সমর্থকের চিৎকার জ্বলে উঠেই নিবে গেল। তারপরেই হাততালি— এবার মেট্রোপলিসের সমর্থকদের। টাইমিং ঠিক না হলেও বাউন্ডারি। উইকেটকিপার ডাইভ দিয়েও উড়ন্ত বলটাকে ক্যাচে পরিণত করতে পারেননি।

পরের বলটা আরও শর্ট পিচ থেকে ছিটকে উঠল। অফ স্টাম্পের লাইনে। জায়গা করে নিয়ে তার সামনে বুক পেতে হুক।

চৌত্রিশ বলে আটচল্লিশটা মণিমুক্তো সংগ্রহ করার পর অলস ভঙ্গিতে ব্যাট চালিয়ে স্লিপের হাতে ধরা পড়ল আবির।

॥ ৩ ॥

আবির না জানলেও দিব্য জানত যে, বিশ্ব ক্রিকেট পরিষদের নির্বাচকমণ্ডলীর চার প্রতিনিধি আজকের খেলা দেখবেন। কিন্তু কেন, তা কারও পক্ষে আন্দাজ করাও সম্ভব ছিল না।

শব্দ ও বুলেটপ্রুফ কাচের খুপরিতে বসে উত্তেজিত ভাবে ব্যাখ্যা করছিলেন দয়াল। ছেলেবেলায় মার্বেল ছাড়া জীবনে দয়াল আর কোনও খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু এই নির্বাচক কমিটিতে তাঁর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বললে ভুল হবে না। দয়াল উজ্জয়িনী মহাবিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান ও মহাকাশ অভিযান কর্পোরেশনের অন্যতম মন্ত্রণাদাতা।

খান্না বললেন, "পুরো ম্যাচের মধ্যে টেম্পারামেন্টের বিচারে আবির সবচেয়ে ইমপ্রেসিভ। লক্ষ করেছেন, মাহফুজ যতই ডেড়লি হোক, মার খেলেই কীরকম লেংথ নষ্ট করে ?"

"আমারও মনে হয় টিম সিলেকশনের সময়ে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।" কমিটির চেয়ারম্যান

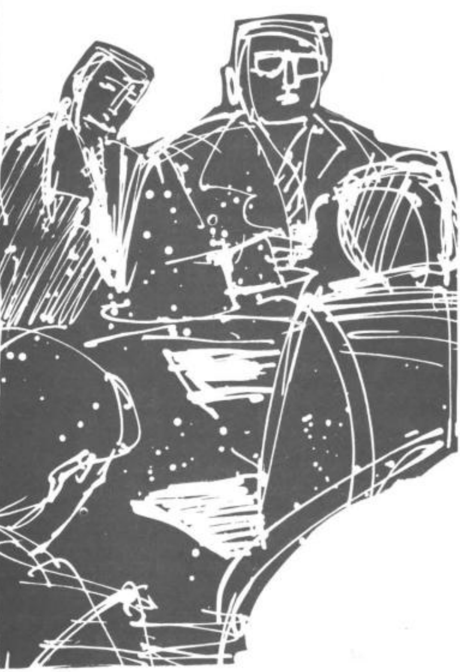

গোপালন সাদা ভুরু কুঁচকে গম্ভীর মুখে বললেন।

মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে নিলাম ডাকার ভঙ্গিতে সেটা ঠুকতে-ঠুকতে দয়াল বললেন, "গুলি মারুন সাইকোলজি ! আগে ফিজিক্স তো সামলান। আমাদের টিমের ব্যাটসম্যানদের ওই আবিরের মতো ভঙ্গিতে দু' পা ফাঁক করে ডাণ্ডা হাতে দাঁড়াতে হবে। প্র্যাকটিস করতে হবে। কিন্তু আবিরের এটা ন্যাচারাল ভঙ্গি, তাই না ? এই গেল নাম্বার ওয়ান। দ্বিতীয়ত, ছোঁড়াটার চাটি-চাপাটিগুলোর পেছনে কবজির মোচড় আছে। শুধু তিড়িবিড়িং করে নেচে বা ধেয়ে গিয়ে যারা ডাণ্ডা হাঁকায়, তাদের দিয়ে কিছু হওয়ার আশা কম।"

চতুর্থ সদস্য শিবশঙ্কর এতক্ষণে মুখ খুলেছেন, "পা ফাঁক করে খেলার কথা যদি বলেন, ডেলিভারির সময়ে মাহফুজের দু' পায়ের মধ্যে যে-ফাঁকটা থাকে..."

"হ্যাঁ, সুড়সুড় করে আছাড় খাওয়ার পক্ষে আইডিয়াল !" নিজের রসিকতায় নিজেই হাসেন দয়াল। "আরে মশাই, পা ফাঁক করে দাঁড়ানোর কথা বলেছি, ছুটে এসে ঠ্যাং ছোঁড়া নয়। আর মাহফুজ কেন, কোনও ফাস্ট বোলারকেই টিমে রাখা যাবে না। সম্ভব নয়।"

"তার মানে ?"

"মানে, ফাস্ট বোলাররা ছুটে এসে বল করে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কে কত জোরে বল করতে পারে সেটা ট্রায়াল শুরু হওয়ার আগে..."

"দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বল করতে হবে ?"

"প্রায় তাই। গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে এসে। জোরে ছুটতে গেলেই পিছলে পড়ার আশঙ্কা। চাঁদের পিঠে মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর ছ' ভাগের এক ভাগ, তা ছাড়া ফ্রিকশনও খুব কম। জানি, স্পেশাল জুতো তৈরি হবে, পিচও হবে নতুন পদ্ধতিতে, কিন্তু তা হলেও ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ওই বরফের ওপর কেড্‌স পায়ে হাঁটার মতো। এবং লুনার টিম এই অবস্থাটাকেই তাদের মূলধন করার চেষ্টা করবে।"

"তা হলে শুধু স্পিনার ?"

"তা কেন ! বাহু বা পেশির জোরকেও তো কাজে লাগানো যায়। তবে আপনাদের ওই সুইং-ফুইং চলবে না। আপনারা জানেন কিনা জানি না, তবে ইস্কুলের ছেলেরা জানে যে, চাঁদে হাওয়া নেই। ফলে..."

"আচ্ছা, আমাদের প্লেয়ারদের পৃথিবীতে বসে ঠিকমতো ট্রেনিং কি দেওয়া সম্ভব ? যাতে ওই স্লিপারি চাঁদের পিঠে..."

"নিশ্চয় ! সেরকম ট্রেনিং গ্রাউন্ড বানালেই হল। একশো ভাগ না হলেও..."

শিবশঙ্কর দয়ালকে বাধা দিয়ে বললেন, "ছিল তো এককালে। সমুদ্রের নীচে একটা ট্রেনিং ফিল্ড। হয়তো সেটাকেই একটু সংস্কার করে নিলে..."

গোপালন বিরক্তভাবে বললেন, "আপনারা বড্ড এগিয়ে গিয়ে ভাবছেন। আমি এখনও মনস্থির করতে পারছি না, চাঁদের পিঠে এই লুনার ওয়ান ডে ম্যাচে খেলানোর জন্য আদৌ বিশ্ব-একাদশ পাঠানো উচিত হবে কি না !"

"তা এই ব্রেন-ওয়েভটা তিন মাস আগে এলেই তো ভাল হত। সারা দুনিয়া চষে চোদ্দজন খেলোয়াড় বাছাই করার পর..."

॥ ৪ ॥

পাড়াটা বনেদি হলেও রাস্তাটা কানাগলি। মাত্র চারটে বাড়ি। রাত সাড়ে দশটায় রাস্তার একমাত্র আলোটা নিভে গেল। এবং বোঝা গেল আজ অমাবস্যা। অন্ধকারেরই একটা অংশ যেন ছিটকে এল রাস্তার ওপার থেকে। একটা লোহার ফটকের একপাশ ঘেঁসে দাঁড়াল। তারপর শুধু মুখটা বাড়িয়ে বাড়ির লাগোয়া ছোট্ট বাগানটাকে জরিপ করল। আর-একটা ছুট। এবারে বাড়ির দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে তারই মধ্যে মিশে যাওয়ার চেষ্টা। পরের দৃশ্য, একটা ইঁদুর যেন রেন-পাইপ বেয়ে দোতলার ছাতে গিয়ে তড়াক করে পাঁচিল টপকে নামল।

পেনসিলের মতো আলোর রেখা ছাতের দরজার ওপর নড়েচড়ে স্থির হয়েছে। তিন নম্বর চাবিটা লেগে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নামা ও ডান দিকে ঘুরে দুটো দরজা ছেড়ে তৃতীয়টার সামনে দাঁড়িয়ে কান পাতা পর্যন্ত একটা মসৃণ গতি। চেনা বাড়ি, নির্দিষ্ট লক্ষ্য।

হাতের ঠেলা দিয়ে দরজার পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকে এল। আর-একবার নিরীক্ষণ। তারপরেই পা চালিয়ে দক্ষিণ কোণে স্টিল ক্যাবিনেটের সামনে। মিনিট তিনেকের মধ্যেই খোঁজাখুঁজির কাজ সাঙ্গ।

পেছনেও ফিরল আর আলোটাও জ্বলল।

একটা ড্রেসিং গাউনের হাতে উদ্যত পিস্তল। দরজার ঠিক মুখে দাঁড়িয়ে। "গুড ইভনিং, কী খুঁজে পেলেন জানতে পারি ?"

"এই দুটো বেআইনি জিনিস।"

"আচ্ছা ! তা হলে পুরনো ভিডিওর দাম বাড়ছে !"

"নির্ভর করে। যেমন এই পুরনো ক্রিকেট ম্যাচের ফিল্মগুলো অবশ্যই দামি ! যাই হোক, হাত থেকে যন্ত্রটা নামিয়ে রাখতে পারেন।

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

ওটা ব্যবহার করলে আপনারই ক্ষতি হবে।"

নাচারের ভঙ্গিতে গৃহকর্তা পিস্তলটা নামিয়ে নিলেন, "সত্যিই আমার কিছু করার নেই। কিন্তু একটা কথা কি জিজ্ঞেস করতে পারি? আমার এই বিশাল সংগ্রহের মধ্যে থেকে দুটো মাত্র..."

কথাটা বলতে-বলতেই উৎসুক ভাবে ভদ্রলোক কয়েক পা এগিয়ে এলেন, "কী ফিল্ম নিলেন বলুন তো?"

"লুনার ইলেভেনের সঙ্গে..." মুখ টিপে হেসে এই প্রথম বোকামির পরিচয় দিলেন আগন্তুক। হাতের ক্যাসেট দুটো কাত করে তার ওপরে সাঁটা লেবেলটা দেখাতে চেয়েছিলেন। সুযোগ পাননি। পিস্তলের বাঁটটা হাতের এক নিঃশব্দ কসরতে কপালের নাগাল পেয়ে গেছে!

"চুরি করবে, আবার ব্ল্যাকমেল!" ড্রেসিং গাউন নিচু হয়ে ক্যাসেট দুটো তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট তিনেকের মধ্যেই ফিরে এসেছেন। খোলা ক্যাবিনেটের থেকে নিরীহ চারটে ভিডিও ক্যাসেট বের করে বেহুঁশ চোরের কাছে কার্পেটে ফেলে দিলেন।

মিস্টার সরকার এবার নিশ্চিন্ত। পুলিশকে খবর দিতে পারেন। বেআইনি ফিল্ম নয়, মূল্যবান বমাল সমেতই ধরা পড়বে।

কিন্তু দু'-একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, কারা সরকারের এই ফিল্ম দুটোর কথা জানে? কারাই বা এগুলো হাতাতে চাইছে? তদন্তের প্রথম স্তরে সরকার পরের দিন প্রথমেই হানা দিলেন 'টিট-বিট কিউরিও শপ'-এ। কারণটা সরল। একটা ফিল্ম এঁদের কাছ থেকেই বছর পনেরো আগে কিনেছিলেন।

"গুড মর্নিং সার! এতদিন পরে!"

"এই একটু খবরাখবর নিতে এলাম। আছে নাকি কিছু?"

"পঁচাত্তর বছরের পুরনো একটা টেস্ট ম্যাচের টিকিট আছে। শস্তাতেই পাবেন।"

"আসল জিনিস কিছু আছে?" গলাটা নামিয়ে সরকার বললেন, "ফিল্ম? চাঁদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার?"

কিউরিও মালিকের মুখে কি একটা দ্বিধার ছায়া খেলে গেল?

"না সার—ভীষণ রিস্কি ব্যাপার। ওসব কারবার ছেড়ে দিয়েছি।"

শেষ চেষ্টা হিসেবে সরকার আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লেন, "ভাল খদ্দের সন্ধানে থাকলে আমার ফিল্ম দুটো বেচে দেব।"

এবার নিঃসন্দেহে লোভ জ্বলে উঠেছে। কিন্তু তারপরেই একরাশ হতাশা। আর এই দুইয়ের ফাঁকে মুখ ফসকে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা, "কালকেও যদি আসতেন একবার!"

তার মানে শাঁসালো খরিদ্দার কেউ না কেউ ছিল এবং ইতিমধ্যে সেই পাখি উড়ে গেছে।

আর প্রশ্ন বৃথা। সরকার বেরিয়ে এলেন।

পাবলিক টেলিফোন বুথ। প্রথম চেষ্টাতেই লাইন পেয়েছেন সরকার।

"হ্যালো, ছন্দক? সরকার বলছি। কাল রাত্তিরে আমার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। কেন ঢুকেছিল বলা কি দরকার?"

মুহূর্তের নীরবতা, তারপরে একটা রুদ্ধশ্বাস, "গুড গড—তা হলে আমার বাড়িতেই শুধু নয়!"

"তাই তো মনে হচ্ছে। নিতে পেরেছে?"

"তিনটে—মানে সব ক'টাই।"

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন সরকার।

পরিচিত আরও দুই সংগ্রাহককে ফোন করেছেন সরকার। তাঁদেরও বাড়ি থেকে চুরি গেছে ওই একই জিনিস। চন্দ্র একাদশের সঙ্গে ওয়ার্ল্ড ইলেভেনের ক্রিকেট খেলার ভিডিও ক্যাসেট। যা

ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার ওপর বহুকাল আগেই সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল।

॥ ৫ ॥

কনফারেন্স রুমের টেবিলের আয়তন, পালিশ এবং সাজসজ্জার বাহার দেখেই অনুমান করে নেওয়া যায় এখানে শুধু সুউচ্চ স্তরের বৈঠক বসে। অর্থসচিব শর্মার চেয়ারটাই শুধু খালি। শর্মা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, লাঞ্চের পরে আসবেন। আলোচনায় অংশ নেওয়ার সময় নেই তাঁর। সইটই করার থাকলে করে দেবেন।

"মিস্টার গোপালন, আপনার টিম নির্বাচন নিশ্চয় কমপ্লিট?" জর্জ লেশনার জানতে চান।

"না, মানে..."

"হোয়াট ডুই ইউ মিন!" লেশনারের গলা সরু হয়ে যায়, "ছ' মাস ধরে সতেরোটা দেশ চষে..."

"ছ'জন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে..." যোগ করেন বিল ও'কিফ।

একটু এগিয়ে বসে টেবিলে দু' কনুইয়ের ভর রেখে গোপালন বললেন, "টিম তৈরি বলতে যদি শুধু ক'টা নাম সংগ্রহের কথা বলেন..."

"ঠিক তাই। বের করে ফেলুন তো লিস্টটা।"

অ্যান্ড্রু মনে করিয়ে দিলেন, "লুনার ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড পৃথিবীর যে ক'টা টিম অ্যাপ্রুভ করেছে তাদের মধ্যে থেকেই কিন্তু..."

গোপালনের কানে কথাগুলো ঢুকেছে বলে মনে হয় না, "দেখুন, সতেরো বছর 'এ' ক্লাস ক্রিকেট খেলেছি আমি। তারপর পঁয়ত্রিশ বছর পেরিয়ে গেছে, কোচিং চালিয়ে যাচ্ছি। আমার ছেলেদের জেনেশুনে এরকম বিপদের মুখে ঠেলে দিতে মনটা সায় দিচ্ছে না।"

"বিপদ ? অজানা ? কী বলছেন আপনি ?"

উত্তেজিত কণ্ঠে লেশনার বলে ওঠেন, "শোধ তুলতেই হবে মিস্টার গোপালন। এই সুযোগ। কেন ভুলে যাচ্ছেন যে, ওই চাঁদের পিঠে আমাদেরই উপনিবেশ থেকে ক্রিকেট টিম এসে বিশ্ব একাদশকে নাজেহাল করেছিল। এই তো বছর পঞ্চাশ আগের কথা!"

"চেষ্টা করলেও বোধ হয় আমার পক্ষে ভোলা শক্ত।" ব্যঙ্গের আভাস গোপালনের স্বরে, "কারণ সেই ম্যাচে আমিই সবচেয়ে বেশি স্কোর করেছিলাম।"

"রিয়্যালি ? অভিনন্দন। খেয়াল ছিল না। কিন্তু তা হলে তো আপনার ভাল করেই জানার কথা যে, চাঁদ থেকে যে টিম এসেছিল তাঁদের খেলোয়াড়রাও সেই প্রথম পৃথিবীতে পা দিয়েছিলেন। তাঁরা অচেনা অজানা পরিবেশে–"

"তা ছাড়া আমি তো আছি। মানে বিজ্ঞানীরা কি ঘাস কাটছেন!" এতক্ষণে মুখ খুললেন দয়াল। "সমুদ্রের তলায় এমন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করব, কোনও অসুবিধেই হবে না। সমুদ্রের তলায় কেন জানেন কি ? ওজনটা যাতে হালকা···"

গোপালন বলে উঠলেন, "দুশ্চিন্তাটা তো আর ফলাফল নিয়ে নয়!"

"কিন্তু তার বাইরে কে আপনাকে মাথা ঘামাতে অধিকার দিল, সেইটাই তো বুঝতে পারছি না!" কখন শর্মা ঘরে এসে ঢুকেছেন, কেউ খেয়াল করেননি।

"তবু, একটা আশঙ্কা···" শর্মার ধারালো দৃষ্টি ক্রমেই যেন গোপালনের গলাটাকে টিপে ধরে, "মানে চন্দ্রবাসীদের চক্রান্ত···এত বছর বাদে হঠাৎ আপ্যায়নটা কেমন যেন···" আমতা-আমতা করে থেমে যান শেষ পর্যন্ত।

কমিটির চেয়ারম্যান কার্লফ শর্মার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "গোপালনের আমাদের ওপর আস্থার অভাব আছে ঠিকই, কিন্তু উনি অনধিকার চর্চা করছেন বলে ভাবাটা ঠিক নয়। বহু বছর ধরে চিনি ওঁকে। এরকম মানুষ হয় না।" এবার গোপালনের দিকে ফিরে কার্লফ বললেন, "আসলে আপনি পুরো ব্যাপারটা ঠিক জানেন না বলেই এসব ফালতু ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন। ভাল করে শুনুন, কুড়ি হাজার দর্শককে চাঁদে নিয়ে আসার জন্য সমস্ত খরচা দিচ্ছেন ওঁরা। আশি শতাংশ পেমেন্ট তো করেই দিয়েছেন। প্ল্যাটিনাম আর ইউরেনিয়ামের মাধ্যমে।"

"কিন্তু কেন ? সেটাই তো প্রশ্ন। যদি ধরেও নিই যে, ওঁদের শাসকরা আমাদের সঙ্গে আবার নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করতে চান, কিন্তু তাঁদেরও তো আবার বিরোধী পক্ষ আছে! নাকি পৃথিবীর অর্থনৈতিক সঙ্কটের একটা সুযোগ···"

"দিস ইজ টু মাচ্।" লেশনার রীতিমত অসহিষ্ণু, "সঙ্কট আমাদের নয়, ওঁদের। নিজেরাই সে-কথা কবুল করেছেন।"

লেশনারকে বাধা দিয়ে কার্লফ বললেন, "নিরাপত্তা নিয়ে এতটুকু ভাবনার কারণ নেই। চাঁদের মাঠে কুড়ি হাজার দর্শকের মধ্যে পাঁচ হাজার সাদা পোশাকের কম্যান্ডো থাকছে। কই, এবার লিস্টটা দিন।"

গোপালন তালিকাটা বাড়িয়ে দিতে-দিতে বললেন, "এখনও কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্লেয়ারদের কারও কাছ থেকেই সম্মতি সংগ্রহ করা হয়নি।"

সভাকক্ষে হাসির তুফান। সোনার সিংহাসনে বসতে চান না এমন লোক কোথায় ?

॥ ৬ ॥

দূরদর্শনের এ-বছরের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'বেহুলা'কে আচমকা থামিয়ে দিয়ে চাঁদের পিঠে ওয়ান ডে ম্যাচ খেলার প্রথম ঘোষণাটি সম্প্রচারিত হল। অগুনতি দর্শকের সঙ্গে পার্থ আর রুদ্রও খবরটা জানলেন।

দু'জনেই শহরতলির নগণ্য ইস্কুলের শিক্ষক। পার্থ ইতিহাস পড়ান। রুদ্র বাংলা। গভীর বন্ধুত্ব। নিজেদের টিভি নেই, তাই হেডমাস্টারের বাড়িতে আসেন প্রতি রোববার।

খবরটা জানা মাত্রই রুদ্র অস্থির হয়ে ওঠেন। টিভিতে আর মন বসে না। মাথা ধরার অছিলায় প্রস্থান করেন। ফলে পার্থরও সুবিধে হয়। একই বাড়ি ভাড়া করে থাকেন দু'জনে। সুবিধে-অসুবিধে ভাগ করার দায়িত্ব তো একটা আছে।

রাস্তায় দেখা হওয়া মাত্র রুদ্র বলেন, "আমাকে যেতেই হবে।"

পার্থ বলেন, "আমাকেও।"

ঠাট্টা করছেন কি না বোঝার জন্য পার্থর দিকে তাকান। বুঝতে পারেন না।

বাড়ি ফেরার পরে পার্থ বলেন, "বন্ধুকে সব কথাই জানানো উচিত। একটা কথাই বাকি ছিল। আমার ঠাকুর্দাকে চাঁদের উপনিবেশে পাঠানো হয়েছিল।"

রুদ্র স্তম্ভিত। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে অজানা বা অল্প-জানা অধ্যায়গুলোর ওপরেই তাঁর সবচেয়ে কৌতূহল। আর সেই কৌতূহল মেটানো প্রায় অসম্ভব, চাঁদের দেশের ব্যাপারে। সরকারি ও সামরিক নিষেধাজ্ঞা মানুষের ইতিহাসের এই একটা পর্বের যাবতীয় নথিপত্র ও উপকরণকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে বের করে দিয়েছে। জাতীয় বা শহুরে কোনও গ্রন্থাগারে কিছু না পেলেও গ্রামাঞ্চলের কিছু অখ্যাত লাইব্রেরি থেকে রুদ্র যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছেন পার্থ তার সবই জানেন। সেটা শুধু বন্ধুত্বের সম্মানে নয়। তথ্য যেমন চাঞ্চল্যকর, তেমনই নিষিদ্ধ তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া। রুদ্রর একমাত্র শ্রোতা পার্থ। এত কথা হয়েছে পার্থর সঙ্গে, তবু এই কথাটা তো কখনও ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেননি।

পার্থ বললেন, "বলিনি, তার কারণ আমি শুধু ওইটুকুই জানি। তার বেশি আর এক ছত্র নয়। আমাদের পরিবারে এই ব্যাপারটাকে

প্রথম থেকেই সবাই চেপে রাখতে চেয়েছেন। বাবাকে যেরকম চিনেছি, তাতে জানলে উনি বলতেন না ভাবা কঠিন। বাবাও কিছু জানতেন না।"

গ্যাস জ্বালিয়ে চায়ের জল চাপাতে-চাপাতে রুদ্র আপন মনে বলেন, "সেটা আর অস্বাভাবিক কী! আমরা তো জানিই যে, পৃথিবী থেকে শুধু দাগী অপরাধীদেরই প্রথমে চাঁদে পাঠানো হয়েছিল উপনিবেশ স্থাপনের জন্য। অন্তত প্রচারটা যে সেরকমই করা হয়েছিল তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই!"

পার্থ বললেন, "সেটাও তো একটা রহস্য। চাঁদের উপনিবেশ নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করার পর থেকেই তো এই প্রচার শুরু। তাই না?"

"মোটামুটি তাই। তবে পুরনো কাগজে দেখেছি চাঁদের প্রথম বাসিন্দাদের মধ্যে যাবজ্জীবন দণ্ডিত বহু অপরাধী ছিল।"

"তাই আমার পূর্বপুরুষ খুনে আসামী হোক বা না হোক, বাড়ির লোকেরা সেই ভয়েই ব্যাপারটাকে পুরো চেপে গেছেন।"

কোনও উত্তর দেন না রুদ্র। তাঁর মাথায় এখন একটাই কথা ঘুরছে। তিনি জানেন, এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে, পৃথিবী থেকে চাঁদে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হওয়ার পরে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে। অক্সিজেন অবরোধ করে চাঁদের উপনিবেশের বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু কীভাবে বেঁচে আছে তারা? কী করছে? কেমন চেহারা তাদের সভ্যতার?

"জানার সুযোগ এসেছে এবার।" পার্থ চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললেন, "যাব বলে লাফালেই তো হল না। টাকাটা আসবে কোত্থেকে? টিকিটের দাম দেখেছিস?"

"দেখেছি। তার ওপর নিশ্চয় ব্ল্যাকও হবে।"

"আলবত!"

দুই বন্ধু অনেক হিসেব করে দেখলন, টস করতে হবে। দু'জনের টিকিট কাটার মতো সংস্থান নেই তাঁদের। টসে রুদ্র জিতে গেলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। বহু কষ্টে কালোবাজারে একটা টিকিট কেনার পর জানা গেল বিশেষ পাশপোর্টের জন্য এবার দরখাস্ত করতে হবে। রুদ্রর দরখাস্ত বাতিল। রুদ্রর লেখা একটা পুরনো প্রবন্ধের মধ্যে পুলিশ সন্দেহজনক গন্ধ পেয়েছে। পার্থর কপালেই আসলে চন্দ্রভ্রমণ লেখা ছিল।

॥ ৭ ॥

"গুড মর্নিং ডক্টর দয়াল! আমি মহাকাশের পোশাক-নির্মাতা স্পেস স্যুট আউট ফিটার-এর তরফ থেকে..."

"মাই গড! আপনিই তো ফোন করেছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কী করে ঢুকলেন আপনি অফিসে? আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে..."

"দেখা করতে চান না আমিও জানি, আপনার দরোয়ানরাও জানে। কিন্তু আমার মনে হয় দেখাটা না হলেই বরং আপনার ক্ষতি বেশি হত।" ভদ্রলোকের চেহারা ও কথা সমান ঝকঝকে।

"ক্ষতি! আমার লাভ-লোকসানের ঠিকেদারি করার ভার দিয়েছি নাকি আপনাকে! দেখুন, আমি কয়েকটা সরল নীতিতে বিশ্বাস করি। পারচেজ কমিটিতে আছি জেনে যারা আমার কাছে উমেদারি করতে আসবে, তাদের অফার অবধি আমি বিবেচনা করব না। আপনি যদি এই মুহূর্তে..."

"ব্রাভো! ব্রাভো! কিন্তু ডক্টর, এক মুহূর্ত তো এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ। সেটা পেরিয়েও গেছে। কিন্তু আমি বলছি, আমার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে হলেও আপনার অভিযোগ করার কিছু থাকবে না।"

দয়াল এত উত্তেজিত যে মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। শুধু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।

অতিথিও উঠে দাঁড়ান। দয়ালের মুখের কাছে মুখ এগিয়ে এনে বিচ্ছিরি ভঙ্গিতে বলেন, "দুর্নীতিটা শুধু ব্যবসাদারদেরই একচেটিয়া, তাই না? আর উজ্জয়িনীর হিরের টুকরো অধ্যাপক নিজের কেরিয়ার গুছোতে যখন তমোঘ্ন রায়চৌধুরীকে...বাকিটা কি শুনতে চান?"

দয়ালের মুখ থেকে রক্ত উবে গেছে।

"বসুন, বসুন, সেসব কথা টেনে আনার কোনওই ইচ্ছে নেই আমার। 'স্পেস-পাওয়ার' নামে আমাদের তৈরি চন্দ্রযাত্রীদের পোশাকটা অনুমোদন করে দিন। পুরনো কাসুন্দি নিয়ে আর কেউ ঘোঁট পাকাবে না।"

দয়ালের কথাগুলো যেন অসংলগ্ন, "কিন্তু, আমি...একা আমি তো...আরও তো সদস্য আছে...কেনার সুপারিশ একা আমি..."

"হ্যাঁ, একা আপনিই পারেন। বোকা সাজার ভান করে পার পাবেন না। আমাদের স্পেস-স্যুটের দাম সবচেয়ে শস্তা। কিন্তু আপনি কারিগরি বিচারের নামে আমাদের পোশাককে নিম্নমানের অভিযোগে বাতিল করতে চাইছেন। যাতে অর্ডারটা সুপার স্পেস কস্টিউম কম্পানি পায়। আর আপনাকে উসকানি দিচ্ছে পারচেজ কমিটিরই আরও দু'জন সদস্য। নাম বলব? দরকার নেই। শুধু জেনে রাখুন, আপনারই মতো এই দুই ন্যায়পরায়ণ সাধু কিন্তু ইতিমধ্যেই বাটারফ্লাই আইসক্রিম কম্পানির কাছ থেকে এমন গিলেছেন যে হজম করতে পারছেন না। ওই সুপার স্পেস কস্টিউম কম্পানি যে পোশাক তৈরি করবেন তার বুকে ও পিঠে একটি করে রামধনু রঙের প্রজাপতি উড়বে। কী বুঝলেন?"

দু' হাতে মুখ ঢেকে ভাঙা-ভাঙা গলায় দয়াল যেন আপন মনেই বলে চলেন, "তিরিশ বছর আগে একটা মানুষের জীবন নষ্ট করেছি। কিন্তু সেইটা গোপন করার জন্য হাজার-হাজার মানুষকে আমি..."

"বোগাস! আপনি অকারণে ভয় পাচ্ছেন। আমরা একটা নতুন সিন্থেটিক কাপড় দিয়ে মহাকাশযাত্রীদের পোশাক বানাচ্ছি। দামটা

ULKA 13145-BEN

কমেছে সেইজন্যই। প্রাণহানির কোনও আশঙ্কা নেই। তবে প্রচলিত পোশাকের তুলনায় আমাদেরটার আয়ু হয়তো একটু কম হতে পারে। কিন্তু যাতায়াত ধরে যেখানে মাত্র দিন দুয়েকের মামলা···"

মহাকাশযাত্রীদের সুলভতম পোশাক-নির্মাতার বিরুদ্ধে আপত্তির কারণগুলো একটা কাগজে টাইপ করেছিলেন দয়াল। সেটাকে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছেন।

"থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর দয়াল! আমি জানতাম আপনি অযৌক্তিক কিছু করবেন না।"

॥ ৮ ॥

চাঁদের আকাশে নিজের কক্ষপথে প্রবেশ করল 'ইকেরাস'। বাইশ হাজার যাত্রিবাহী পারমাণবিক শক্তিচালিত মহাকাশতরী। পাইলট শিপ। পনেরো মিনিটের ব্যবধানে একে-একে এরকম আরও পাঁচটি স্পেস-শিপ আসবে পৃথিবী থেকে।

চাঁদের মহাকাশ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্বাগত জানাল ইকেরাসকে। বলল, চাঁদের ফেরি রকেট তিন দফায় যাবতীয় যাত্রীদের চাঁদের পিঠে বহন করে নিয়ে যাবে। ফেরি রকেটের আসনসংখ্যা আট হাজার। প্রথম দফায় স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেট টিম, চিকিৎসক, টিভি-প্রদর্শক, বিশ্ব ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সদস্য ও বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থাদের প্রতিনিধিদের তারা নিয়ে আসবে।

ফেরি রকেটের বায়ু-নিরোধক অর্গল ঠেলে যাত্রীরা পা ফেললেন মেট্রো-স্টেশনের মতো কিন্তু আরও রাজকীয় চেহারার মহাকাশ-বন্দরের অভ্যন্তরে। নীল ছিট-ছিট গোলাপি জ্যোতিময় এক ধরনের কাচ দিয়ে তৈরি দেওয়াল। ধুলো-ময়লার চিহ্ন নেই, নেই কোনও প্রাণেরও লক্ষণ। দেওয়ালের গায়ে জায়গা-বিশেষে বিনি সুতোয় ঝুলিয়ে রাখা বিচিত্র সব রং আর রেখার সচল কারিকুরি। সচল মানে তারা ক্ষণে-ক্ষণে বদলাচ্ছে। ছাঁচে ঢালা ভারী-ভারী সোনালি ও রুপোলি ফ্রেমে আবদ্ধ না থাকলে বোঝা মুশকিল হত এগুলি চন্দ্রবাসীদের শিল্পকর্মের নমুনা।

কোনও লুম্যান অর্থাৎ চন্দ্রবাসীকে এখনও দেখা যায়নি। শুধু ট্রান্সমিটারে শোনা গেছে তাদের নম্র কণ্ঠের আপ্যায়ন ও নির্দেশ। স্পেস-স্টেশনের চত্বর থেকেই যাত্রী বোঝাই করে মোনো রেল যাত্রা শুরু করল। চাঁদের এই প্রধান ভূ-পরিবহণ ব্যবস্থা যাত্রীদের জিওর্দানো ব্রুনো স্টেডিয়ামে বয়ে নিয়ে যাবে। দূরত্ব একশো সতেরো কিলোমিটার।

স্টেডিয়ামে পৌঁছে মোনো রেল থেকে নামার পর চাঁদের শোভা মুগ্ধ করল দর্শকদের। রাত নেমেছে। কালো মখমলের মতো আকাশ। পালিশ-করা অন্ধকার। তারই মাঝে ঠিক মাথার ওপরে রাজকীয় ভঙ্গিতে ঝুলে রয়েছে সাদা মেঘের ছোপমাখা নীল একটি গোলক, যার নাম পৃথিবী। চিনা লণ্ঠনের মতো স্নিগ্ধ ও শীতল আলো ছড়াচ্ছে, কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও অনেক বেশি তার দ্যুতি। চোখ নয়, মন ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

আকাশের আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর চোখ পড়ে মাটিতে। জিওর্দানো ব্রুনো স্টেডিয়াম প্রকৃতির হাতেই তৈরি। পৃথিবীর প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা দূরবীক্ষণে চোখ লাগিয়ে চন্দ্র পর্যবেক্ষণের সময়ে এই ধরনের এলাকাকে 'সমুদ্র' বা 'মারে' বলে অভিহিত করেছিলেন। এদের স্বরূপ ধরা পড়েছিল অনেককাল বাদে। নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বা ক্রেটার এগুলো। কিন্তু ক্রেটারের কিনারা জুড়ে কাচের মতো স্বচ্ছ কোনও পদার্থের ছাউনির নীচে পাতা চেয়ারে বসে পৃথিবীর দর্শকদের মনে হচ্ছে বিশাল এক ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে

এসেছেন তাঁরা। লুম্যানদের গ্যালারি ঠিক বিপরীত প্রান্তে। আয়তন দেখেই অনুমান করা যায় যে, চাঁদের জনসংখ্যা খুব বেশি নয়। কারণ, প্রচুর অর্থব্যয় করে এই খেলার আয়োজন তাঁরা করেছেন। এখানে ক্রিকেট নিশ্চয় জনপ্রিয়। তা সত্ত্বেও হাজার পাঁচেকের বেশি আসন নেই চন্দ্রবাসীদের গ্যালারিতে।

ধূসর মাঠের ওপর একটি সাদা রেখা ক্রিকেট ফিল্ডের সীমানা নির্দেশ করছে। ঘাসের কোনও চিহ্ন নেই, কিন্তু পিচের অংশটার রং হালকা সবুজ। পিচের একপ্রান্তে স্টেডিয়ামের ওপারে বিরাট এক লাল-রঙা গম্বুজ। গম্বুজের মাথা চিরে বেরিয়ে রয়েছে যেন কামানের একটা নল। পিচের অপর প্রান্তে রয়েছে স্টেডিয়ামেরই সংলগ্ন মৌচাকের মতো চেহারার একটা বাড়ি।

স্পেস-স্যুটের সঙ্গে লাগানো মাইক্রোফোন থেকে লুম্যানদের ধারাবিবরণী শোনা যাচ্ছে। পৃথিবীর চল্লিশটি ভাষার যে-কোনও একটি দর্শকরা পছন্দ মতো বেছে নিতে পারেন। ইচ্ছে করলে পৃথিবীর ভাষ্যকারদের বিবরণীও শুনতে পারেন।

ধারাভাষ্য জানিয়ে দেয় লাল গম্বুজটা চাঁদের অসংখ্য মানমন্দিরের মধ্যে একটি। আর তারই বিপরীতে স্থাপত্যের অদ্ভুত নিদর্শনটি একাধারে প্যাভিলিয়ন এবং টিভি ও বেতার প্রচারকেন্দ্র। পিচে ঘাসের বদলে আছে কৃত্রিম তন্তু। ঘাসের নিকটতম বিকল্প। চাঁদে বাতাস না থাকায় দর্শকদের খেলা উপভোগে বিঘ্ন ঘটতে পারে ভেবে একটা নতুন ব্যবস্থা করা হয়েছে। দর্শকদের আনন্দ, উল্লাস, হাততালি বা ধিক্কার মাইক্রোফোন ব্যবস্থা এমনভাবে প্রত্যেকের কানে পৌঁছে দেবে যে, মনে হবে যেন পৃথিবীর মাঠে বসেই খেলা দেখছেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

১৯২৪—'৩১ : ডি হ্যাভিল্যান্ড মথ বিমান

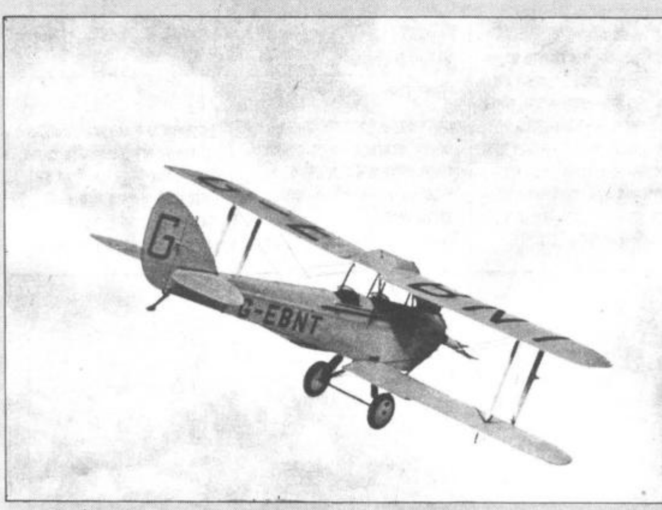

আকাশে জিপসি মথ

প্রশিক্ষণের জন্য বা আনন্দ ভ্রমণের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে এই মথ বিমানগুলি। ডি· হ্যাভিল্যান্ড ডি·এইচ-৫০, পুস মথ, জিপসি মথ, টাইগার মথ বিমান বহু দেশে সমাদৃত হয়েছে ও এই বিমানে বহু দূরপাল্লার অভিযান হয়েছে। এর মধ্যে টাইগার মথ বিমান তৈরি হয়েছে ৮,৩০০টি। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে একটি ডি·এইচ-৪৫০ বিমানের সাহায্যে ইংল্যান্ড-ভারত বিমানপথ জরিপ করা হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন ইংল্যান্ডের অসামরিক বিমান চলাচল দফতর ও ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ। ইংল্যান্ড থেকে ১৯২৪-এর নভেম্বরে রওনা হন জেনারেল সার উইলিয়াম সেফটন ব্র্যাংকার, বৈমানিক অ্যালান কবহ্যাম ও এঞ্জিনিয়ার আর্থার ইলিয়ট। নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁরা কলকাতা আসেন ১৯২৫-এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। কলকাতায় বিমানটি নামে রেসকোর্সের ভেতরে। পরে কবহ্যাম রেঙ্গুন অবধি যান। কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি উড়ে যান ও সেখান থেকে দার্জিলিং, পাহাড়ের ওপর পাক খেয়ে ঢাকা হয়ে কলকাতায় ফেরেন। কবহ্যাম আর-একবার ভারতে আসেন ১৯২৬ সালে, এবারেও ডি·এইচ-৫০ বিমানে। পথে ঘটে যায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, বাগদাদ থেকে বন্দর আব্বাসের পথে আরব বেদুইনরা বিমান লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে, এর ফলে এঞ্জিনিয়ার আর্থার ইলিয়ট গুলিবিদ্ধ হন ও প্রচুর রক্তপাতের ফলে বসরা পৌঁছনোর আগেই মারা যান, বসরায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। অভিযানের শেষে ইংল্যান্ডে ফিরলে রাজা পঞ্চম জর্জ কবহ্যামকে 'নাইট' উপাধি দেন। ভারতের প্রথম বিমানসংস্থা টাটা সন্স পুস বিমানের সাহায্যে ভারতের প্রথম বেসরকারি ডাক ও যাত্রী চলাচল আরম্ভ করেন ১৯৩২ সালে। টাটা সন্স হল এয়ার ইন্ডিয়ার পূর্বসুরি। এর কর্ণধার ছিলেন জে·আর·ডি· টাটা। ১৯৩২-এর ১৫ অক্টোবর উনি একটি পুস মথ বিমানে করাচি থেকে আমেদাবাদ, বোম্বাই ও বেলারি হয়ে মাদ্রাজ অবধি বিমান চালিয়ে সার্ভিস শুরু করেন।

ডি-এইচ-৬০ জিপসি মথ বিমানের বিশদ বিবরণ :

নির্মাতা : ডি·হ্যাভিল্যান্ড এয়ারক্রাফ্‌ট কম্পানি, ইংল্যান্ড।
ডানার আয়তন : ৯·১৪ মিঃ।
লম্বায় : ৭·২৮ মিঃ।
বৈমানিক ও যাত্রী : একজন বৈমানিক ও একজন যাত্রী।
গতিবেগ : ঘণ্টায় ১৬০ কি· মি·।
এঞ্জিন : একটি ১০০ অশ্বশক্তির ডি·এইচ·জিপসি-১ এঞ্জিন।

ক্যাম্পাস

বিজ্ঞানসচেতন ছাত্ররা

সম্প্রতি কলকাতার ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে এক শিবিরের আয়োজন হয়েছিল। এর উদ্যোক্তা ছিলেন 'সেন্ট্রাল পলিউশান বোর্ড'। এই কর্ম শিবিরের মূল উদ্দেশ্য, গঙ্গার জল দূষণমুক্ত রাখার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা। তাতে অংশগ্রহণ করেছিল চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের ইংরেজি বিভাগের ছাত্ররা। কৌশিক চ্যাটার্জি তৈরি করেছিল একটি মডেল, যার নাম 'সেভ হোলি গঙ্গা— আওয়ার মাদার'। এই মডেলটিই গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। এই মডেলটিতে প্রদর্শিত হয়, গঙ্গার জলের খরতা ও পঙ্কিলতাবৃদ্ধি পাচ্ছে। জলে ক্ষারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে অন্ধত্বের সংখ্যা বেড়ে যাবে। চর্মরোগ সৃষ্টি হবে, আর পঙ্কিলতা বাড়তে থাকলে মাছের উৎপাদন কমে যাবে। এ ছাড়া, উত্তর

বিজ্ঞান-মডেল তৈরি করেছে ছাত্ররা

চন্দননগরের গঙ্গার বর্তমান যা অবস্থা হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে গঙ্গার প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। এর জন্য পলি-সংস্কার একান্ত জরুরি।
ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জির মডেলটির নাম 'ওয়েলথ ফ্রম গারবেজ'। এটিও রাজস্থানে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্তরের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে দেখানো হয় এবং শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায়। এই মডেলে দেখানো হয়েছে, কলকাতায় প্রত্যেক বছর যে পরিমাণ জঞ্জাল জমা হয় তা একদিন পাহাড়ের আকার নিতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরিত্যক্ত কাঠটুকরো থেকে মূল্যবান মিথাইল অ্যালকোহল, অ্যাসিড পাওয়া যেতে পারে। ডিমের খোসা, মাছের আঁশ ও কাঁটা দিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যেতে পারে। এর সাহায্যে এটাই প্রমাণ করা হয়েছে, এই পথে পরিবেশ দূষণ যেমন রোধ করা সম্ভব, তেমনই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও সম্ভব।
কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের বিজ্ঞানশিক্ষক প্রবীর ঘোষ জানালেন, "বিজ্ঞানকে এখন যথোপযুক্ত কাজে লাগাতে না পারলে সমূহ ক্ষতি। তাই প্রতি বছর আমি ছাত্রদের নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক কিছু-কিছু কাজ করে চলেছি।" পাশাপাশি জাতীয় সেবা প্রকল্পে এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। যেমন, বন্যা বা খরা কবলিত এলাকায় যথাযোগ্য ত্রাণব্যবস্থা, মৃত্তিকা পরীক্ষা, বৃক্ষরোপণ, বয়স্ক শিক্ষার কাজ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বস্তি পরিষ্কার।

সমীর ঘোষ

সুন্দর ছবি আঁকে সুমিত

সুমিত দত্ত তমলুক মহকুমার পদুমবসান গ্রামের কৃতী ছেলে। হাতের তুলিতে তার কী ছন্দ, কী রং! কী সুন্দর ছবি আঁকে সে! এই ছবি আঁকার উল্লেখযোগ্য সাফল্যও সে পেয়েছে বারবার। তবে নবম শ্রেণীতে পড়াকালীন (১৯৮৮ সালে) সুমিত যে স্বীকৃতি পেয়েছে, সেটাই ওর সবচেয়ে বড় সাফল্য। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে 'নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম' আয়োজিত 'সারা বাংলা ছবি-আঁকা প্রতিযোগিতা'য় সুমিত অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান পায় এবং 'নেহরু ট্যালেন্ট সার্চ অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে। এইভাবে

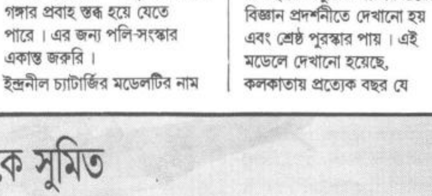

সুমিত রাজ্যস্তরে সুযোগ পেয়ে, সেখানেও প্রথম হয়। তারপর ওই ছবি নিয়ে সারা ভারতের এক প্রতিযোগিতাতেও সুমিত আবার প্রথম স্থান দখল করে এবং পুরস্কার গ্রহণের জন্য 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার' কর্তৃক আমন্ত্রিত হয় দিল্লিতে। বাবা-মাকে নিয়ে দিল্লির ওই পুরস্কার-গ্রহণ অনুষ্ঠানে গিয়ে রাজেন্দ্রকুমারী বাজপেয়ীর হাত থেকে পদকটি গ্রহণ করে। মাসে-মাসে ৫০ টাকা করে স্টাইপেন্ডও পাবে।

সৌম্যেন্দু সামন্ত

পেয়েছি !
আহ্ !
উঁহুহ্ !
দরজা খোলো ! জলদি !
খুলছি···একটু দাঁড়াও ···আমি···

কৃষ্ণ দ্বীপের রহস্য

কপিরাইট : কাস্টারম্যান এস. এ.

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাট ম্যান
স্বঘোষিত খুনির খোঁজে ব্যর্থ হয়ে ফিরে ব্যাটম্যান আর রবিন দেখল লাশ নেই, আছে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি চিঠি, সই করেছে 'কুটিল মানুষ' !
রবিন, ব্যাপারটা বুঝতে পারলে ? "এক যে ছিল কুটিল মানুষ কুটিল পথে হেঁটে কুড়িয়ে পেল কুটিল সিকি কুটিল সিঁড়ি ঘেঁটে..." ইত্যাদি । কুটিল মানুষ তার অপরাধের ধারা বোঝাতে...
...আদ্যিকালের ছড়া ব্যবহার করেছে ! চিঠির 'কাব্যিক' শব্দটা একটি সূত্র !
ছড়ার পঙক্তি অনুযায়ী কুটিল মানুষকে খোঁজার চ্যালেঞ্জই ও জানিয়েছে !
পরের পঙক্তিতে আছে 'কুটিল পথে হেঁটে ।' কাজেই একটা মানচিত্র থাকবে...আর তা-ই আছে...চিঠির উলটো পিঠে ।
তা হলে চলো, হাঁটতে শুরু করি !
খানিক বাদে...
উফ ! অলিগলিতে ছুটে হাঁপ ধরে গেছে !
'কুটিল পথ' প্রায় ফুরিয়ে এসেছে !
এই তো...পুরনো মেলার মাঠে যাওয়ার অস্থায়ী সুড়ঙ্গপথ ! মানচিত্রে এখানে '×' চিহ্ন আছে !
আমরা যেন ওখানে চিহ্নিত হয়ে না-যাই !
বাহ্ ! খুন করার আদর্শ জায়গা ! কিন্তু কুটিল সিকি আর কুটিল সিঁড়ি কোথায় ?
ওখানে ! ওই কুটিল ঘোরানো দরজা ...আমার ভুল না হলে কুটিল সিকিটাও ওই বাক্সের মধ্যে আছে !
আরে ! ভেতরে আরও একটা বাক্স !
বাহ্ ! এর মধ্যেও একটা বাক্স !
মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াবে !
নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী ! একটু পরে...
তা হলে...বাক্সের সংখ্যা কত হল ?
দারুণ মজা—চুপ করো, নইলে...
আরে ! এটাই তো মনে হচ্ছে ! বাঁকা একটা পুরনো সিকি ! ছড়ার সেই কুটিল সিকি !
হ্যাঁ...এই সেই সিকি !
আর এই আমি ! হি ! হি !
কুটিল মানুষ !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

নানারকম

ধাঁধা

এবার পুজোর ছুটিটা ছোট্‌কার বাইরে-বাইরেই কাটল। বলা যায়, আন্তর্জাতিক সফর। নানান জায়গা থেকে রঙিন ছবি-ছাপা পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিল ছোট্‌কা। তার কিছু

পৌঁছেছে। কিছু এখনও আসতে বাকি। ছোট্‌কা ফিরে এল, কিন্তু চিঠি পৌঁছল না, এ-এক তাজ্জব ব্যাপারই বটে! সে যাক। একটা ব্যাপারই এর মধ্যে আনন্দের। ছোট্‌কা মস্কো থেকে আমাকে যে-পোস্টকার্ডটা পাঠিয়েছিল, সেটা আমি ঠিক সময়েই পেয়ে গেছি। সেই ছোট্ট চিঠিটার মধ্যে ছোট্ট একটা ধাঁধা যোগ করে দিয়েছিল ছোট্‌কা, পুনশ্চ হিসেবে। সেই ধাঁধাটা দিয়েই শুরু করব এবার। এই ধাঁধার নাম দেওয়া যাক, মস্কোর ধাঁধা।

প্রথম ধাঁধা ॥ একটা প্রমাণ আকারের ইটের ওজন ৪ কিলোগ্রাম। এর ঠিক চার ভাগের এক ভাগ মাপের একটা ইটের ওজন কত হবে? মনে রেখো, বড় ইটটা যে-উপাদানে তৈরি, ছোট ইটটাও সেই একই উপাদান দিয়ে তৈরি। কী মনে হচ্ছে? খুবই সহজ এই সমস্যাটা? নাকি একটু জটিলতা আছে? সহজ না জটিল, তা বলব না।

উত্তরটা চাই।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ চারটে ১ দিয়ে সবচেয়ে বড় সংখ্যা কীভাবে লেখা যায়?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কোন শব্দটি বেমানান? পশুরাজ, মৃগেন্দ্র, হর্যক্ষ, বৃক, কেশরী।

গতবারের উত্তর ॥ (১) এর উত্তর করতে হবে খুব ঠাণ্ডা মাথায়। অঙ্কের বুদ্ধি প্রয়োগ করে। কী করে? প্রথমে থলিগুলোতে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত চিহ্ন দিয়ে নিতে হবে। এর পর যত নম্বরের থলে, তার থেকে বের করে নিতে হবে ঠিক ততগুলো করে বাটখারা। অর্থাৎ, ১ নম্বর থলে থেকে একটি বাটখারা, ২ নম্বর থলে থেকে দুটি, ৩ নম্বর থলে থেকে তিনটি, এইভাবে ১০ নম্বর থলে থেকে দশটি পর্যন্ত বাটখারা বের করে নিতে হবে। প্রত্যেকটি বাটখারার ওজন যদি ১ কেজি হত, তা হলে মোট ওজন হত, ১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০=৫৫ কেজি। কিন্তু তা হবে না। যেহেতু একটি থলেতে রয়েছে ১১০০ গ্রামের বাটখারা, তাই মোট ওজন ৫৫ কেজির থেকে বেশি হতে বাধ্য। এখন, ক'শো গ্রাম ওজন বেশি হয়েছে, সেটা জানলেই বোঝা যাবে কোন নম্বরের থলেতে রয়েছে বেশি ওজনের বাটখারা। একশো গ্রাম বেশি হলে ১ নম্বর থলেতে বেশি ওজনের বাটখারা, দু'শো গ্রাম হলে ২ নম্বর থলেতে রয়েছে—এই হিসেব আর কি। (২) 'স'। (৩) পরামানিক।

সত্যসন্ধ

কত কথা

তিনটি শব্দ তৈরির জন্য তিনজোড়া সূত্র দেওয়া থাকল। বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে না যে, প্রতিটি শব্দই হবে দ্ব্যর্থক, তাই দুটো করে সূত্রের ব্যবস্থা। নাও, এবার কাজে লেগে যাও :

(ক) অলঙ্কারবিশেষ ; রামায়ণে এর কাছে রাবণ বিলক্ষণ অপদস্থ হয়েছিল। (খ) সোনা ; পুষ্পবিশেষ। (গ) পর্বত ; টাকাপয়সাও এমন হয়।

২। 'কুম্ভকর্ণ' শব্দটির মধ্যে পর-পর মোট ক'টি এবং কী কী শব্দ পাওয়া যাবে?

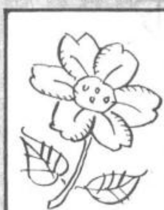

৩। একটি ফুলের নাম তিনবার দেওয়া হল। শূন্যস্থান পূরণ করলে তিনটি ফুল হবে।

—মল্লিকা
—মল্লিকা
—মল্লিকা

উত্তর : ১। (ক) অঙ্গদ। (খ) কাঞ্চন। (গ) অচল। ২। কু, কুম্ভ, কুম্ভক, কর্ণ—মোট চারটি শব্দ। ৩। চন্দ্রমল্লিকা, গিরিমল্লিকা, বনমল্লিকা।

কথক

মজার খেলা

পুজো-পুজো ভাবটা এখনও যেন কাটেনি। তার ওপর সামনেই ভাইফোঁটা। তাই খুব জম্পেশ একটা মজার খেলা শেখা দরকার। এমন খেলা, যা ভাইফোঁটার দিনেই দারুণ মজার খোরাক হবে। বেশ, তেমনই একটা খেলা শিখি এসো। চব্বিশটা পোড়া দেশলাই কাঠি কি সমান মাপের টুথপিক জোগাড় করে সেগুলো দিয়ে পাশের ছবির মতন একটা নিরীহ চেহারার ছবি সাজাও টেবিলের ওপর :

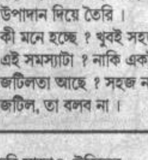

দ্যাখো, ন'টা সমান মাপের বর্গক্ষেত্র জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনে। এবার কী করতে হবে শোনো। এর থেকে আটটা কাঠি এমনভাবে তুলে নিতে হবে যে, মাত্র দুটো বর্গক্ষেত্র পড়ে থাকবে টেবিলের ওপর। ওহো, একটা কথা, বন্ধুদের কিন্তু এমন কথা ভুলেও বোলো না যে, দুটো সমান মাপের বর্গক্ষেত্র পড়ে থাকবে টেবিলের ওপর। তা হলে কিন্তু সব মজা নষ্ট। কেন? তার কারণ হল, এর সমাধানটা এমনই যে, দুটো অসম মাপের বর্গক্ষেত্র শেষাবধি পড়ে থাকছে। এই যা! সাবধান করতে গিয়ে বোধ হয় সমাধানের ইঙ্গিতই দিয়ে ফেললাম। সমাধান কি হয়ে গেছে তোমাদের? আমার কিন্তু হয়ে গেছে। আমি কীভাবে করেছি নীচের ছবিতে দ্যাখো—

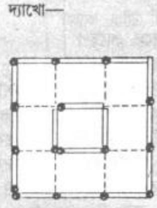

যে-কাঠিগুলো সরে যাবে সেগুলোকে - - - চিহ্ন দিয়ে দেখানো হল। কী, দারুণ মজার খেলা না?

মজারু

ছবি : দেবাশিস দেব

গল্প

বাড়ি ফেরার পর

শুক্তি চৌধুরী

চার মাস পর ছোটু আজ আবার এই বাড়িতে পা দিল। বাড়ির সামনে করবী গাছটা এখনও উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বড় রাস্তা দিয়ে গলির মুখে মোড় ঘুরতে গিয়ে এখনও জগদীশের পানের দোকানটা চোখে পড়ে।

সেই করবী গাছ, পানের দোকান···সবকিছু এখনও সেই একরকম রয়ে গেছে। কেউ কোথাও বিন্দুমাত্র বদলায়নি।

তা হলে কি শুধু ছোটুই বদলে গেছে? মাস চারেক আগে হস্টেলে প্রথমবার যাওয়ার সময় মা'র কোলে মুখ রেখে সে ট্যাক্সিতেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

"ছিঃ ছোটু কাঁদতে নেই।" ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে মা বলেছিলেন, "দ্যাখো, হস্টেলে তোমার কত নতুন বন্ধু হবে, নতুন বই-খাতা, বিছানা আরও কত!"

"আমি যাব না!"

"বোকা ছেলে কোথাকার!" ছোটুর মাথায় ঠোঁট ছুঁইয়ে ফিসফিস করে মা বলেছিলেন, "বড় হয়ে তুমি একা-একা ইংল্যান্ড, আমেরিকা, আরও কত জায়গায় পড়াশোনা করতে যাবে। আর এখন, এই হস্টেলে একা-একা থাকতে পারবে না?"

"একা থাকার প্রশ্নই নেই।" বাবা বলেছিলেন, "হস্টেলে তোমার ঘরে তোমারই কোনও না কোনও ক্লাসমেট থাকবে। আর দু'জন সিনিয়ার স্টুডেন্ট!"

কান্না ভুলে গিয়ে ছোটু মুখ তুলে প্রশ্ন করেছিল, "একটা ঘরে কতজন ছেলে থাকে বাবা?"

"চারজন।" বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, "আর হস্টেলের প্রত্যেক ফ্লোরেই দু'জন মাস্টারমশাই থাকেন, কোনও অসুবিধে হলে তুমি সঙ্গে-সঙ্গে ওঁদের জানাতে পারো।"

"মাস্টারমশাইরা মারেন, বাবা?"

"পড়া না পারলে দু-এক ঘা মারেন বইকী! কিন্তু তুমি ওসব ভাবছ কেন?" ছোটুর চোখের দিকে তাকিয়ে বাবা প্রশ্ন করেছিলেন, "তুমি তো বলেছ হস্টেলে গিয়ে ভাল হয়ে থাকবে। তাই না?"

বাবার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ছোটু আবার মা'র কোল ঘেঁষে বসেছিল। মা'র কানের কাছে আস্তে-আস্তে কীসব যেন

বিড়বিড় করে বলছিল।

"কী বলছে ?" ট্যাক্সির জানলা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বাবা মা'কে প্রশ্ন করেছিলেন।

গড়িয়া ব্রিজ পেরিয়ে ট্যাক্সি তখন ফাঁকা রাস্তায় হু-হু করে ছুটছে। এক নতুন রাস্তায়, নতুন দিকে। এর আগে ছোট্টু এই রাস্তায় কোনওদিন পা দেয়নি।

হাওয়ার দাপটে মা'র কপালে ফেলে রাখা চুলগুলি কানের লতিতে জড়িয়ে যাচ্ছিল। সেদিকে খেয়াল না করেই ছোট্টুর মাথাভর্তি কোঁকড়া চুলে আঙুল বুলিয়ে দিতে-দিতে মা বাবার কথায় সাড়া দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ও আমার কাছে নতুন একটা প্রমিস করছে।"

" কী প্রমিস ?"

" ছোট্টু বলছে এবার থেকে ও খুব ভাল হয়ে থাকবে। পড়াশোনা, খেলাধুলো সব ব্যাপারেই হস্টেলের নিয়মও মেনে চলবে।" কেমন যেন ধরা-ধরা গলায় কথাগুলি বলতে বলতেই মা আচমকা ট্যাক্সির জানলার বাইরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

"ডান দিকে। আর একটু এগিয়ে..." বাবা ট্যাক্সির ড্রাইভারকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, "ওই প্রথম বাড়িটার সামনে রাখুন।"

বাড়িটা এখনও সেই একরকম রয়ে গেছে। দোতলা এক সাদা রঙের বাড়ি। সবুজ দরজা, জানলা। এই বাড়ির প্রতিটি সিঁড়ি, দেওয়াল, দরজা, জানলা ছোট্টুর কাছে ভীষণ...ভীষণ পরিচিত। এটা ছোট্টুর নিজের বাড়ি।

আজ প্রথম ছোট্টু হস্টেল থেকে বাড়ি ফিরছে। স্কুলে গরমের ছুটি শুরু হয়ে গেছে, এই সময় প্রত্যেক ছাত্রকেই হস্টেল থেকে বাড়িতে ফিরে যেতে হয়। এক মাস টানা, লম্বা ছুটি!

ট্যাক্সির হর্নের শব্দ পেয়েই মা দোতলা থেকে নেমে এসে দরজা খুলে দিয়েছেন। ড্রাইভার গাড়ির পেছনের ক্যারিয়ারটা খুলে দিয়েছে, বাবা সেখান থেকে ছোট্টুর ট্রাঙ্ক, বেডিং এ সমস্ত নামাচ্ছেন।

"সব ঠিক আছে তো ?" ট্যাক্সির কাছে আসতে-আসতে মা প্রশ্ন করেছেন।

চার মাস হস্টেলে থেকে ছোট্টু অনেক বদলে গেছে। আগে সে যখন-তখন ছুটোছুটি, দাপাদাপি করত, হঠাৎ-হঠাৎ মা'র কাছে এসে ছোট্টু দুই হাত দিয়ে মা'কে জড়িয়ে খিলখিল করে হেসে উঠত। এখন সে রীতিমত গম্ভীরভাবে ট্যাক্সির দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

"পরীক্ষা ভাল দিয়েছো তো ?" বাড়িতে ঢুকতে-ঢুকতে মা প্রশ্ন করেছেন, "কেমন হল হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা ?"

এক বছর আগে হলে ছোট্টু এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিত না। বরং দু' হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলত, "আজ আইসক্রিম খাব, হ্যাঁ মা ?"

"ছাড়, পড়ে যাব।"

"মা, আইসক্রিম..."

"আগে বল, পরীক্ষা কেমন হল।"

"পরীক্ষা ভাল হলে আইসক্রিম দেবে তো ? জানো মা, আমি না শুধু একটাই অঙ্ক পারিনি। রনি, বনি, মিতুল...ওরা তিনটে অঙ্ক করতে পারেনি।"

এগারো বছরের ছোট্টু আজ আর মা কে সেইভাবে জড়িয়ে ধরল না, আইসক্রিম খাওয়ার জন্য বায়না করল না। ছোট্ট করে সে উত্তর দিল, "ভাল।"

"তোমার জন্য আমের শরবত বানিয়ে রেখেছি," মা বলেছেন, "মুখ-হাত ধুয়ে নাও, কেমন ?"

"মা!" ছোট্টু আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিল, "ননাদি কোথায় ? ননাদিকে দেখছি না তো!"

॥ ২ ॥

"হ্যাট, হ্যাট ঘোড়া, হ্যাট!"

ছোটবেলায় ননাদি ঘোড়া সাজত। ছোট্টু সওয়ার সেজে ননাদির পিঠে দমাস করে লাফিয়ে উঠত। চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে মানুষ-ঘোড়া চলতে শুরু করত।

"তুমি এত আস্তে যাও কেন ?" ছোট্টু দু'হাতে ননাদির পিঠে দুমদুম করে কিল মেরে বলত, "আরও জোরে যেতে পারো না ? রবিনহুডের ঘোড়ার মতো!"

রান্নাঘর থেকে হাঁ-হাঁ করে মা ছুটে আসতেন। "ও কী হচ্ছে ছোট্টু ? ছিঃ! ওকে ওইভাবে মারছ কেন ?"

ননাদির পরনে একটা রঙিন স্কার্ট। এ বাড়িতে আসার পর বাবা ওকে এই স্কার্টটা কিনে দিয়েছিলেন। স্কার্টের ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে ননাদি উঠে দাঁড়িয়ে বলত, "না মাসিমা, আমার একদম লাগেনি।"

"তুমি থামো! ওভাবে গুম-গুম করে কিল মারলে লাগে না!"

কেমন যেন অদ্ভুত বোকা-বোকা হাসিতে মুখ ভরিয়ে ননাদি বলত, "না মাসিমা, আমার একদম লাগে না। জানেন, দেশের বাড়িতে আমার ছোট ভাইও এভাবে আমার সঙ্গে ঘোড়া-ঘোড়া খেলত।"

দুপুরে অফিস যাওয়ার সময় মা স্কুলের দরজার সামনে ছোট্টুকে নামিয়ে দিতেন। বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে ছোট্ট এক কিন্ডারগার্টেন স্কুল। ছোট্টুর বয়সী ছেলেমেয়েরাই এখানে পড়ে।

বিকেলবেলায়, স্কুল ছুটির সময় হরদেবদা ঠুক ঠুক করতে করতে রিকশ নিয়ে হাজির হত। বাবাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, হরদেবদার রিকশয় চেপে রোজ ছোট্টু স্কুল থেকে বাড়ি ফিরত।

"খেয়ে নাও," ননাদি বলত, "এই নাও, মা তোমার জন্য পুডিং বানিয়ে রেখে গেছেন।"

"আমি খাব না।"

"শোনো ছোট্টু," ননাদি তখন ছোট্টুর থেকে কত বড় ? বড়জোর বছর চারেকের। সেই বয়সেই সে ছোট্টুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বলত, "না খেলে তুমি যুদ্ধ করবে কী করে ? সব পাজি, বদমাশ লোকদের যুদ্ধে হারাতে হবে না!"

"দূর বোকা!" ছোট্টু খিল-খিল করে হেসে বলত, "টারজান কি পুডিং খায় ? অথচ ওর গায়ে কত জোর। জানো ননাদি, টারজান না হাতির পিঠে চেপে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়।"

ননাদির ওপর ভার ছিল। অনেক কাজের ভার। বাবা, মা, ছোট্টু কেউ যখন বাড়িতে থাকত না, তখন দুপুরবেলায় ননাদি বাড়ি পাহারা দিত। ছোট্টু স্কুল থেকে ফিরলে, চরকি-পায়ে ওর পেছনে সারা বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে ওকে টিফিন খাওয়ানো। টিফিন-পর্ব শেষ হলে বিকেলবেলা ওকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া। সন্ধেবেলা ফিরে এসে রান্নাঘরে মা'কে সাহায্য করা।

"ননাদি আমাদের বাড়িতে কাজ করে, মা ?"

"ছিঃ ছোট্টু," মা ধমক দিয়েছিলেন, "ওভাবে বলতে নেই। ননাদি তোমার দিদির মতো।"

মাসের প্রথম রবিবার বাড়িতে একজন বৃদ্ধ আসতেন। হেঁটো ধুতি, ফতুয়া পরা এক বৃদ্ধ। ননাদির দাদু। বাবার সঙ্গে কীসব যেন কথা বলতেন।

"আপনারা দেবতার মতো লোক।" সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাবাকে একদিন বলছিলেন, "এখানে তাও দুটো খেতে-পরতে পাচ্ছে। জানেন, গত সালের বন্যায় আমার শেষ ঘরটাও পড়ে গেল। সবাই মিলে কোনওমতে স্কুলবাড়ির ছাদে মাথা গুঁজে...নাতনিটা তাও এখানে ভালই আছে, তাই না কত্তা ?"

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ননাদিকে কোনওদিন বাড়ি নিয়ে যেতে চাননি।

"ননাদি, তোমার বাড়ি কোথায় ?"

"অনেক দূরে।" গল্প করতে-করতে ননাদি বলত, "বাস থেকে নেমে নৌকোয় করে নদী পার হতে হয়। কাঁসাই নদী।"

"খুব বড়, নদী ? কত বড় ? হাওড়ার গঙ্গার চেয়েও বড় ?"

কালীপুজোর পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ছোট্টু আচমকা মাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, "মা, আজ আমরা মামাবাড়ি যাব ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি মামাকে ভাইফোঁটা দেবে, তাই না মা ?"

"হ্যাঁ।"

"মা, তুমি যেমন ছোটমামার দিদি...আমার সেরকম কোনও দিদি নেই কেন ? আমাকে কেউ ভাইফোঁটা দেয় না কেন, মা ?"

বাবা বাজারে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে তিনি মাকে বললেন, "বেশ তো, ওর যখন এতই ইচ্ছে, তখন ননাই ওকে এবার ভাইফোঁটা দিক।"

ননাদির হাতে ছোট্টুর সেই প্রথম ভাইফোঁটা। বাবা বাজার থেকে মিষ্টি কিনে এনেছিলেন।

"ওইভাবে কেন ?" ননাদির কড়ে আঙুলটা তার কপালের দিকে এগিয়ে আসতে তীব্র অভিমানে ছোট্টু কেঁদে বলেছিল, "মা ছোটমামাকে যেভাবে দেয়, সেইভাবে। ধান, চন্দন...এসব কই ?"

"এই ছেলেটার এত বায়নাক্কা," বিরক্তভাবে মা বলেছিলেন, "কিছুতেই শান্তি নেই।"

"মাসিমা," আস্তে-আস্তে ননাদি বলেছিল, "ওই পার্কের কোণে অনেক দুব্বোঘাস আছে। নিয়ে আসব ?...জানেন মাসিমা, দেশের বাড়িতে আমার ভাইকেও না আমি এইভাবে ধান-দুব্বো দিয়ে ভাইফোঁটা দিতাম।"

॥ ৩ ॥

"যদি প্রথম নল দিয়ে পনেরো মিনিটে চৌবাচ্চা ভর্তি হয়, তা হলে..." বাবা বলেছিলেন, "এক মিনিটে কত অংশ ভর্তি হচ্ছে ? একের পনেরো অংশ।"

আর কয়েকদিন বাদেই ছোট্টুর নতুন স্কুলে অ্যাডমিশন টেস্ট। পাশ করলে পাড়ার এই স্কুল ছেড়ে ছোট্টু চলে যাবে নতুন স্কুলে। সেখানে সে হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করবে। অফিস থেকে ফিরেই বাবা আজকাল তাকে পড়াতে বসেন। অঙ্ক, ইংরেজি গ্রামার, জেনারেল নলেজ, আরও অনেক সব দুর্বোধ বিষয়!"

"কী হল ? বুঝতে পারছ ?" বাবা আচমকা ধমক দিয়েছিলেন।

"স্পাইডারম্যান ওই চৌবাচ্চায় নামতে পারত, বাবা ?"

ফটাস করে গালে একটা বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় ছুটে এসেছিল। রীতিমত হতাশভাবে বাবা চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন, "এর কিস্যু হবে না। বড় হয়ে রিকশ টানবে। দিন-রাত টি·ভি· আর রাজ্যের সব কমিক্‌স...গোল্লায় গেছে।"

"আস্তে!" মা ছোট্টুকে বাবার রাগ থেকে আড়াল করতে-করতে বলেছিলেন, "তোমাকে পড়াতে হবে না। একদিন পড়াতে বসেই মেরেধরে—ছেলেকে কি একদিনেই বিদ্যাসাগর করবে, না কি ?"

"ওই অপদার্থকে দিয়ে কিস্যু হবে না।

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্পনা করো

এবারে আঁকার পাতায় কী আঁকার কল্পনা করেছি তোমরা ভাবার চেষ্টা করো। আমি শুধু এই সংখ্যায় আভাস দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আগামী সংখ্যায় মিলিয়ে নিও আমার কল্পনার সঙ্গে তোমাদের কল্পনা মিল খুঁজে পেল কি না।

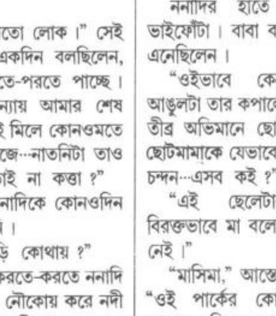

হাসিখুশি — শতদল

রিন্টু : সমু আমাকে 'গাধা' বলেছে।
টুকাই : তুমি কখনওই এ-অপমান সহ্য কোরো না।
রিন্টু : আমাকে কী করতে বলো ?
টুকাই : তুমি সমুকে বলো, কথাটা প্রমাণ করতে।

দিদিমণি : কোথায় সুখ আছে বলতে পারো ?
ছাত্র : অভিধানে!

ঝুমা : বাবা, কলকাতা থেকে মস্কোর দূরত্ব ঠিক কত কিলোমিটার ?
বাবা : আমি ঠিক হিসেবটা বলতে পারছি না।
ঝুমা : তোমার অজ্ঞতার জন্য দেখছি কাল আমাকে দিদিমণির কাছে বকুনি খেতে হবে।

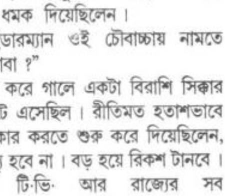

হাতি সম্বন্ধে ঝুমকি লিখেছে : হাতি হল একধরনের গোলগাল জন্তু, যার সামনে ও পেছনে দুটো লেজ আছে।

ছবি : দেবাশিস দেব

চৌবাচ্চা শুনলেই যে স্পাইডারম্যানের কথা ভাবে···"

ননাদি গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে এসেছিল। আস্তে-আস্তে সে বলেছিল, "মেসো, আপনি রাগ করছেন কেন ওইভাবে?"

"এই ননাটাকে পড়ালেও অনেক কাজ হত।"

সেইরকম বোকা-বোকা মুখ নিয়ে ননাদি বলেছিল, "জানেন মেসো, আমি তো গ্রামে ক্লাস ফাইভ অবধি পড়েছিলাম। ওই নল-চৌবাচ্চা···অঙ্কটা আমাকে বুঝিয়ে দেবেন?"

বাবার রাগ একবার দপ করে জ্বলেই আবার পরমুহূর্তে নিভে যায়। উনি অবাক হয়ে বললেন, "তুই বুঝবি এই অঙ্ক? তুই ফ্র্যাকশন জানিস?"

"ফ্র্যাকশন মানে?"

"ভগ্নাংশ।"

"ওই এক-এর, দুই, এক-এর পাঁচ ওইগুলো তো? হ্যাঁ, মাস্টারমশাই শিখিয়েছিলেন।"

"খাতা নিয়ে আয়। বোস এখানে।"

ঘণ্টা দুয়েক ধরে বাবা ননাদিকে অঙ্ক বোঝাতেন। কিন্তু ননাদির কাজ কি সেখানেই শেষ হবে? নিজের জন্য সে বেছে নিয়েছিল আরও বড় এক কাজ।

"ছোট্টু, তুমি মেছোভূতের গল্প জানো?"

"না!" গল্পের গন্ধ পেয়ে ছোট্টু ননাদির কাছে এসে বলত, "মেছোভূত কী, ননাদি?"

"মাছ খায় এরকম ভূত। গায়ে খুব শক্তি।"

"ফ্যান্টমের চেয়েও বেশি শক্তি?"

"ফ্যান্টুম-ম্যান্টুম জানি না।" ননাদি বলত, "আমার দাদু একবার বিলের ধার দিয়ে আসছিলেন। ঘুটঘুটে, অন্ধকার রাত।"

"তারপর?"

অদ্ভুত হেসে ননাদি বলত, "না, পরে বলব।"

"পরে না। এখনই বলো।"

"আগে তুমি একটা কাজ করো।"

"কী কাজ?"

"ধরো, একটা চৌবাচ্চায় দুটো নল আছে। একটা নল দিয়ে জল ঢোকে, আর-একটা দিয়ে বের হয়।"

কৌতূহলী চোখ নিয়ে ছোট্টু শুনতে থাকত। এই আগ্রহ নিয়ে সে যা কিছু শোনে, তাই তার মনে গাঁথা হয়ে যায়।

অ্যাডমিশন-টেস্টে একবারেই পাশ করে গিয়েছিল ছোট্টু। কেউ তাকে আটকাতে পারেনি।

॥ ৪ ॥

"মা, ননাদি কি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে?"

"না, আসবে এখনই।"

হস্টেলে যাওয়া মানে কি ক্রমশ বাড়ির সঙ্গে একটা যোজন-বিস্তৃত দূরত্ব তৈরি হওয়া? যে ননাদি একদিন তাকে ভাইফোঁটা দেওয়ার জন্য ছুটতে-ছুটতে পার্কের কোণ থেকে দূর্বাঘাস ছিঁড়ে এনেছিল, রাত দশটা অবধি ঘুমে ঢুলতে-ঢুলতেও বাবার কাছে অঙ্ক বুঝেছে, সেই ননাদি কিনা আজ এখনই বাড়িতে নেই। ছোট্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

ছোট্টুর ঘরের টেবিলে টিনটিনের নতুন কমিক্স বই। ও কমিক্স পড়তে ভালবাসে বলে মা কিনে এনেছেন। গরমের ছুটিতে এবার চুটিয়ে কমিক্স আর ডিটেকটিভ গল্প পড়বে ছোট্টু। এই কমিক্স নিয়েই কি ননাদির সঙ্গে এককালে সে কম মারপিট করেছে?

"তুমি এত বোকা কেন? স্পাইডারম্যান কে ছিল জানো?"

"তুমি সূঁচ-রাজকুমারের গল্প জানো?" ননাদি তর্কে না হেরে পালটা প্রশ্ন করত।

"দুর, তুমি তো স্কুলেই যাও না। তা হলে স্পাইডারম্যান পড়বে কী করে? জানো ননাদি, আমাদের আন্টি না আজ ক্লাসে রবিনহুডের গল্প বলেছেন। তোমাদের গ্রামের আন্টিরা গল্প বলতেন, ননাদি?"

"আমাদের গ্রামে কোনও আন্টি নেই ছোট্টু।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে ননাদি বলেছিল, "আমার মা গল্প বলতেন। লক্ষ্মীর পাঁচালির গল্প। তারপর, সেই বন্যা···"

"মা," ছোট্টু আচমকা কী একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, তার আগেই ডোরবেলটা কর্কশ স্বরে হঠাৎ বেজে উঠেছে।

বাড়ি ফেরার প্রথম দিনেই যে এত বিশাল এক চমক তার জন্য অপেক্ষা করছিল, ছোট্টু তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি।

দরজার সামনে ননাদি। পরনে নীল স্কার্ট, সাদা জামা। স্কুলের পোশাক। কাঁধে একটা বইয়ের ব্যাগ।

"ছোট্টু এসে গেছ?" ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে ননাদি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

"তোকে তো বলাই হয়নি," মা বিস্মিত ছোট্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলছিলেন, "তোর বাবা ননাদিকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। হেডমিস্ট্রেস তো ননার কথা শুনে অবাক। একটা পরীক্ষাও নিয়েছিলেন, তাতেও ননা পাশ করে গেল। তোর বই পড়তে-পড়তেই ও অনেক কিছু শিখে গেছে।"

"জানো ছোট্টু, আমি এখন তোমার টিনটিন, স্পাইডারম্যান···সব পড়তে পারি।"

"জানিস তো," মা হেসে বললেন, "ননাও আজকাল ভীষণ কমিক্স পড়ে। তোর পুরনো বইগুলি।"

"ছোট্টু, তুমি ব্যাটম্যান পড়েছ? আজ তোমাকে আমি ব্যাটম্যানের গল্প বলব, হ্যাঁ!"

"ব্যাটম্যান না," ছোট্টু আচমকা ননাদিকে বাধা দিয়ে বলল, "ননাদি, তুমি আজ আমায় নতুন একটা গল্প বলবে?"

"কী গল্প?"

"তোমার স্কুলের গল্প। আমি তোমায় বলব হস্টেলের গল্প।" ···খুশিতে ঝলমল ছোট্টু বলে উঠল, "তুমি তোমার নতুন স্কুলের গল্প বলবে তো, ননাদি?"

ছবি : অনুপ রায়

রাজার অভিষেক

ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে সম্পন্ন হয় ব্রিটেনের নতুন রাজার অভিষেক

ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অন্যতম প্রতীক রাজমুকুট। যুগ-যুগ ধরে ব্রিটেনের জনসাধারণ বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মান জানিয়ে এসেছেন এই মুকুটকে। যখনই নতুন কোনও রাজা বা রানির অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে, রাজমুকুটের অধিকারী হয়েছেন নতুন এক মানুষ, তখনই তীব্র উল্লাস আর আড়ম্বরের মাধ্যমে জনসাধারণ এই মুকুটকে জানিয়েছেন তাঁদের শ্রদ্ধা। পুরনো রাজার মৃত্যু হলেই ইংল্যান্ডে শুরু হয়ে যায় নতুন রাজা (বা রানির) যুগ। রাজার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যদের ডেকে পাঠানো হয় 'উত্তরাধিকার-মন্ত্রণালয়' বা 'অ্যাকসেশন কাউন্সিল'-এ। সেখানে সদস্যরা সবাই সম্মিলিতভাবে এক ঘোষণাপত্রে নতুন রাজার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করেন। লন্ডন, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন সামরিক কলেজের অধ্যক্ষরা এই ঘোষণাপত্র পাঠ করেন, প্রত্যেক শহরের মেয়রকেই এই ঘোষণাপত্রের প্রত্যয়িত নকল পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর পর, পুরনো রাজার জন্য শোকপালনের পর্ব। রাজসভা থেকে শুরু করে সমস্ত দেশ তখন মৃত সম্রাটের জন্য শোকপালন করছে। সারা দেশ জুড়ে তখন শুধু শোকের ছায়া। কয়েকদিন পর, শোকপর্ব যখন শেষ হয়ে যায়, ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে সম্পন্ন হয় নতুন সম্রাটের অভিষেক। এই অভিষেক-অনুষ্ঠানের দায়িত্ব বংশানুক্রমিকভাবে ব্রিটেনের আর্ল মার্শালের হাতে ন্যস্ত। অভিষেকের আগে তিনি দায়দায়িত্ব বিষয়ক একটি কমিটি গঠন করেন। বিভিন্ন ব্যক্তি এই অভিষেকে বংশানুক্রমিকভাবে যেসব দায়িত্ব পালন করছেন, তা তাঁরা এবার কীভাবে পালন করবেন তা স্থির করে এই কমিটি। বংশানুক্রমিক এইসব প্রাচীন অধিকার পালনের অনেক উদাহরণ আছে। অভিষেকের দিন সকালে লর্ড গ্রেট চেম্বারলিন নতুন রাজার কাপড় বহন করেন। অভিষেক শেষ হওয়ার পর এক সান্ধ্যভোজে সকলকে আপ্যায়িত করার দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। অভিষেকের সময় ওয়েস্টমিনস্টারের ডিন ও চ্যাপ্টার স্বয়ং ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপকে বিভিন্ন অভিষেক-বিধি ও রীতিনীতি পালন করতে সাহায্য করেন। ডারহ্যাম, বাথ এবং ওয়েলস-এর বিশপদেরও একটি বিশেষ অধিকার আছে। অভিষেকের সময় ডারহ্যামের বিশপ নতুন সম্রাটের ডান হাত ধরে থাকেন, বাথ এবং ওয়েলসের বিশপ ধরে থাকেন বাঁ হাত। ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে সম্পন্ন হয় এই অভিষেক। বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে অবধি সেদিন বের হয় বর্ণাঢ্য এক বিশাল শোভাযাত্রা। সেই শোভাযাত্রায় অভিষেক-রথে বসে থাকেন নতুন রাজা বা রানি। ততক্ষণে রাজসভার সব অমাত্য ও সভাসদবর্গ, রাষ্ট্রের সম্ভ্রান্ত কর্ণধাররা জমায়েত হয়েছেন অ্যাবেতে। নতুন রাজা এবার বসবেন সিংহাসনে। (প্রাচীন নিয়মে, অভিষেকের দিন রাজাকে বসতে হত পবিত্র এক পাথরের ওপর। 'স্টোন অব স্কোন' বা 'পবিত্র নরম বালি-ময়দার পাথর' এরকমই এক পাথর। সেই পাথর এখন সিংহাসনের নীচে রাখা থাকে।) সমস্ত অভিষেক-অনুষ্ঠানটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে, জনসাধারণ বরণ করে নেন নতুন রাজাকে ও নতুন রাজা শপথবাক্য পাঠ করেন। ওয়েস্টমিনস্টার স্কুলের ছাত্ররা বহু প্রাচীনকাল থেকে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আসছে। দ্বিতীয় পর্বে, এক ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী রাজাকে বিশেষ একধরনের তেল মাখানো হয়। প্রাচীন স্যাকসন যুগ থেকে এই বিধিটি আজও চলে আসছে। এর পর ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ নতুন রাজার মাথায় মুকুটটি পরিয়ে দেন ও তাঁর হাতে ধরিয়ে দেন রাজতন্ত্রের প্রতীক রাজদণ্ড, আংটি ইত্যাদি। এর পর রাজসভায় প্রধান যাজক 'লর্ড স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড টেম্পোরাল' জানান তাঁর শ্রদ্ধা।

এই শপথবাক্য কিছুই নয়, রাজা ও জনসাধারণের মধ্যে এক চুক্তি। জনসাধারণ এক নতুন রাজাকে জানাচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস ও আনুগত্য। পরিবর্তে সম্রাটও দেশের আইন, রীতিনীতি মেনে রক্ষা করবেন এই রাষ্ট্রকে, ঈশ্বরের নৈতিক আদেশ তিনি উঁচু করে তুলে ধরবেন তাঁর এই ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে। রক্ষা করবেন এই প্রোটেস্টান্ট ধর্মকে।

প্রশ্ন

(১) কলকাতার সবচেয়ে পুরনো ক্রিকেট-ক্লাবের নাম কী ? **অতনু হালদার**, রসুলপুর বি এম হাই স্কুল, বর্ধমান ।
(২) একটি টেনিস-কোর্টের দৈর্ঘ্য কত ? **কুনাল ঘোষাল**, রসুলপুর বি এম হাই স্কুল, বর্ধমান ।
(৩) রবি কাপুর হিন্দি সিনেমায় কী নামে বেশি পরিচিত ? **অশোক রায়**, বেহালা ।
(৪) টেস্ট ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ ধরার রেকর্ডটি কার দখলে রয়েছে ? **রঞ্জন চক্রবর্তী**, বর্ধমান ।
(৫) সুকুমার রায় ১৯ বছর বয়সে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । সেই ক্লাবের নাম কী ? **সমর দাশগুপ্ত**, কলকাতা-১৪ ।
(৬) স্ট্রেপ্টোমাইসিন কে আবিষ্কার করেছিলেন ? **সমর দে**, কলকাতা-২৭ ।
(৭) ডঃ নেলসন ম্যান্ডেলা যে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন, সেই জেলটির নাম কী ? **দুলাল দাস**, রেলওয়ে হাই স্কুল, জোরহাট ।
(৮) সার রিচার্ড হ্যাডলির টেস্ট-জীবনের প্রথম শিকার কে ? **মিতা দে**, চেতলা ।
(৯) ইকুয়েডরের রাজধানীর নাম কী ? **সেখ নসিব আলি**, রসুলপুর বি এম হাই স্কুল, বর্ধমান ।
(১০) কোন ভারতীয় হকি-খেলোয়াড় সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক হকি-ম্যাচ খেলেছেন ? **সেখ লালু**, রসুলপুর বি এম হাই স্কুল, বর্ধমান ।
(১১) এ আই এস এস এফ-এর সম্পূর্ণ নাম কী ? **কমল সিওয়া**, জলপাইগুড়ি ।
(১২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্ট বিখ্যাত কুস্তিগির ছিলেন ? **সুমন দাস**, কল্যাণী ।
(১৩) 'আইডলস' গ্রন্থের রচয়িতা কে ? **সুদীপ্ত বাগচি**, পাঁচশিমুল, বর্ধমান ।
(১৪) 'জার্মান চিরুনি'কী দিয়ে তৈরি ? **সরিৎ গুহ**, শিলিগুড়ি ।
(১৫) 'ফুটওয়েল' (পায়ের নীচের গর্ত) কোথায় থাকে ? **মানস দত্ত**, বহরমপুর ।
(১৬) মার্গারেট থ্যাচার, দিয়েগো মারাদোনা, বো ডেরেক ও

নিল ও'ব্রায়েন

মনোজকুমারের মধ্যে মিল কোথায় ? **স্বাতী চৌধুরী**, রানাঘাট ।
(১৭) জর্জ বুশের স্ত্রীকে আমেরিকানরা আদর করে ডাকেন 'গ্র্যানি' বা 'ঠাকুরমা' তাঁর আসল নাম কী ? **মৌসুমী সেন**, কাঁচরাপাড়া ।
(১৮) কোন ব্রিটিশ রাজনীতিকের ডাকনাম 'দ্য টারজান' ? **অধীর রায়**, নিউ জলপাইগুড়ি ।
(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) বোট রেস ।
(২) ইউরোপিয়ান কমন মার্কেট ।
(৩) দামোদর নদ ।
(৪) ইংরেজি ।
(৫) গড বি উইথ ইউ ।
(৬) মহাযান ।
(৭) বিজয় কশ্যপ ।
(৮) জিন হুয়া ।
(৯) কারাকাস ।
(১০) যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে ।
(১১) সুনীল গাওস্কর ।
(১২) আট ।
(১৩) ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ।
(১৪) তরু দত্ত ।
(১৫) হরিশ ভিমানি ।
(১৬) ট্রেসি চ্যাপম্যান ।
(১৭) মোনিকা সেলেস ।
(১৮) গেহাইমে স্টাট্‌সপোলিজেই ।
(১৯) টিউমার ।
(২০) জেরুজালেমে । হিটলারের গণনিধন যজ্ঞে যে ছ' লক্ষ ইহুদি প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে তৈরি স্মৃতিস্তম্ভ ।
(২১) মাদাম রোঁলা । গিলোটিনে মাথা দেওয়ার আগে ওই কথা বলে তিনি আর্তনাদ করে উঠেছিলেন ।
(২২) মোটর ওয়াগন । তৈরি করেছিলেন কার্ল ফ্রেডরিখ বেন্‌জ ।

মোনিকা সেলেস

গাওস্কর

তরু দত্ত

লেনিন

কুইজ

বিষয় : মালয়েশিয়া

প্রশ্ন

(১) মালয়েশিয়ার জাতীয় ভাষা কী ?

(২) মালয়েশিয়ার মুদ্রার নাম কী ?

(৩) মালয়েশিয়ার জাতীয় বিমান-পরিবহণের নাম কী ?

(৪) ভূমিপুত্র কাদের বলা হয় ?

(৫) মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। নদী দুটির নাম কী ?

(৬) মালয়েশিয়ার কোন রাজ্য বেতের কাজের জন্য বিখ্যাত ?

(৭) মালয়েশিয়ার কোন ফসল সবচয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে ?

(৮) মালয়েশিয়াতে কোন জিনিসকে 'পাডি' বলা হয় ?

(৯) আঁকাবাঁকা ফলকের একজাতীয় ছোট্ট মালয়েশীয় ছোরা পৃথিবীতে খুব বিখ্যাত। ওই ছোরার নাম কী ?

(১০) ভারতীয় সংসদের মতো, মালয়েশিয়ার সংসদ বা দিওয়ানও দুটি কক্ষে বিভক্ত। এই দুই কক্ষের নাম কী ?

কুয়ালালামপুর

(১১) মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কীভাবে নির্বাচিত হন ?

(১২) মালয়েশিয়ার গ্রাম বা কেম্পং-এর বাড়িগুলির অদ্ভুত একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কী সেই বৈশিষ্ট্য ?

(১৩) ১৯৬৩ সালে মালয়েশিয়া স্বাধীন হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে সেই রাষ্ট্রের একটি অংশ বেরিয়ে গিয়ে স্বাধীন এক প্রজাতান্ত্রিক দেশ গঠন করেছিল। কী সেই নতুন দেশ ?

(ক) (খ) (গ)

প্রশ্ন

(ক) মালয়েশিয়ার কোন গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হচ্ছে ?

(খ) মালয়েশিয়ার এই শস্য খেতে কোন ফসলের চাষ করা হচ্ছে ?

(গ) উৎসব উপলক্ষে আত্মরক্ষামূলক হাতের এই মুদ্রার নাম কী ?

ছবির পরিচয় : (ক) রাবার। (খ) ধান। (গ) সিলাট।

(১৪) 'পেনাং-এর উকিল' কাকে বলে ?

(১৫) পৃথিবীতে একমাত্র বোর্নিওতেই দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির এক বনমানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্থানীয় ভাষায় সেই বনমানুষের নাম 'জঙ্গলের মানুষ'। জঙ্গলের সেই মানুষ পৃথিবীতে কী নামে বেশি পরিচিত ?

(১৬) মালয়েশিয়াতে কখন 'জরুরি অবস্থা' জারি করা হয়েছিল ?

(১৭) মালয়েশিয়ার একটি অংশ একসময় এক ব্রিটিশ পরিবারের শাসনাধীন ছিল। 'সাদা রাজা' নামেই সেই রাজপরিবার অধিকতর পরিচিত। ওই পরিবারের শাসনাধীন মালয়েশিয়ার অংশটির নাম কী ?

ভোজ্য তেলের জন্য পাম চাষ

(১৮) ১৯৭৫ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ হকিতে কোন দেশ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ?

(১৯) 'সাতায়' মালয়েশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় একটি খাবারের নাম। এই খাবারটি আসলে কী ?

(২০) 'বাবা চিনা' কাদের বলা হয় ?

উত্তর : (১) বাহাসা মালয়। (২) 'রিঙ্গিত' বা মালয়েশীয় ডলার। (৩) মাস। (৪) মালয়েশিয়ার স্থানীয় বাসিন্দা। এই বাসিন্দারাই ভূমিপুত্র নামে পরিচিত। (৫) কেলাং ও গোম্বাক। (৬) মেলাকা বা মলাক্কা। (৭) রাবার। (৮) ধান। ইংরেজি 'প্যাডি' শব্দটি ওই মালয়েশীয় শব্দ থেকে উদ্ভূত। (৯) ক্রিস। (১০) 'দিওয়ান নেগারা' বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত 'জাতীয় কক্ষ' ও 'দিওয়ান রাইয়াত' বা 'জনগণের কক্ষ'। (১১) মালয়েশিয়ার নয়টি রাজ্যের শাসক বা সুলতানদের মধ্যে থেকে যে কোনও একজনকে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত করা হয়। (১২) সব বাড়ি ঠেকা দেওয়া বাঁশের ওপর তৈরি হয়। (১৩) সিঙ্গাপুর। (১৪) হাঁটার জন্য একধরনের লাঠি। পেনাং মালয়েশিয়ার একটি রাজ্য। (১৫) ওরাং-ওটাং। (১৬) ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬০ সাল অবধি মালয়েশিয়া কম্যুনিস্ট গেরিলাদের অভ্যুত্থান দমন করতে ব্যস্ত ছিল। ওটিই সে দেশের ইতিহাসে 'জরুরি সময়'। (১৭) সারাওয়াক। ব্রিটেনের ব্রুক পরিবার ওই অঞ্চল শাসন করতেন। (১৮) ভারত। বিশ্বকাপ হকিতে ওটিই আমাদের একমাত্র বিজয়। (১৯) শিক কাবাবের মতো, একটি দণ্ডে গাঁথা গ্রিল্‌ড মাংসের টুকরো। চিনেবাদামের সস দিয়ে পরিবেশন করা হয়। (২০) যেসব চিনদেশীয় মানুষ স্থানীয় মালয়েশীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছেন, মালয়েশীয় পোশাক পরিধান করেন ও সেই ভাষা গড়গড় করে বলতে পারেন।

Amul
MILK CHOCOLATE
বদমাইস মোটকার জন্যে
Amul
CRISP
MILK CHOCOLATE
ঘ্যানঘেনে পিংকির জন্যে
RADEUS/AMC/036/90-BEN
Amul
FRUIT
& NUT
MILK CHOCOLATE
শয়তান ছোটকার জন্যে
Amul
MILK CHOCOLATE
ORANGE
FLAVOURED
আমার সবচেয়ে আদরের প্রীতির জন্যে
Amul
Badambar
চামচা চিন্টুর জন্যে
Amul
CRUNCH
MILK CHOCOLATE
আমার টীচারের জন্যে
Amul
ORANGE
Amul
Amul
MILK
CHOCOLATE
এসবই আমারই আমার জন্যে
বিক্রী ব্যবস্থায় :
গুজরাট কো-অপারেটিভ
মিল্ক মার্কেটিং
ফেডারেশন লিঃ
আমূল চকোলেট — তোমার ভালোবাসার পাত্রের জন্যে সেরা উপহার !

ANANDAMELA 17 OCTOBER 1990 REGD.NO.
WB/CC/264 MH BY SOUTH 683 TN/MS(C) 731

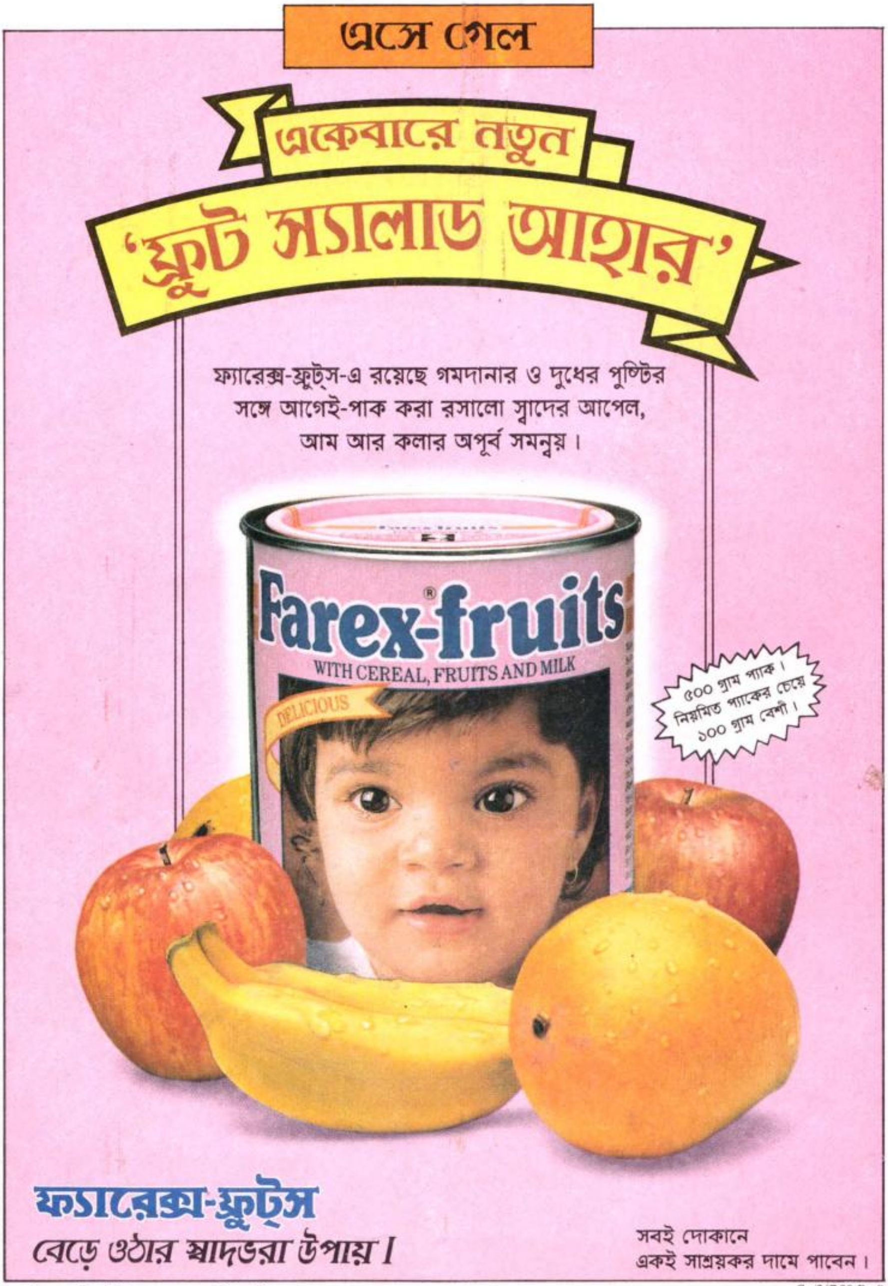

বর্তমানে নির্ধারিত বাজারগুলিতেই পাওয়া যাচ্ছে।

Gx/247.90 Bn R